আহমদীয়া জামাতের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে

একজন আদর্শ আহমদী

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

আহমদীয়া জামাতের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে

একজন আদর্শ আহমদী

অনুবাদ ঃ নাজির আহমদ ভুঁইয়া

প্রকাশনায় ঃ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ
রমযান - ১৪১৯
জানুয়ারী - ১৯৯৯
পৌষ - ১৪০৫

মেসার্স ইন্টারকন
১১/৪, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০

بسم الله الرحمن الرحيم

দু'টি কথা

বিগত হাজার বছর ধরে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা ও আদর্শ যেভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছিলো এবং মুসলমানগণ অবক্ষয়ের প্রবল স্রোতে যেভাবে হাবুডুবু খাচ্ছিলো তাথেকে মুসলমানদের উদ্ধারকল্পে মহানবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাঁর প্রিয় উম্মতের সংশোধনকল্পে তাঁরই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক গত শতাব্দীতে আবির্ভূত হন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালাম। তিনি এসে ঐশী-নির্দেশ মোতাবেক প্রতিষ্ঠা করেন একটি বিশ্ব জামাত, নাম তার আহমদীয়া মুসলিম জামাত। এ জামাতের লোকদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যাবলী কী ধরনের হওয়া উচিত তা তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় রচিত তাঁর প্রায় ৮৮ খানা পুস্তকের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। সেই পুস্তকগুলো থেকে তাঁর শিক্ষাকে বিষয়-ভিত্তিক চয়ন করে এ পুস্তকখানা সংকলন করা হয়েছে উর্দূ ভাষায়– 'হযরত বানী সিলসিলা আহমদীয়া কি নযর মে এক আসলী আহমদী'। এ পুস্তকখানা 'আহমদীয়া জামাতের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে একজন আদর্শ আহমদী' নামে অনুবাদ করেছেন জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া। শুধু আহমদীয়া জামাতের সদস্য হওয়ার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। যদি আহমদীগণ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকের নিরিখে নিজেদের আদর্শ আহমদী বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তবেই তাদের মুক্তি লাভ হবে এবং তাঁর (আঃ) আগমন সার্থক হবে।

আল্লাহ্তাআলা বাংলা ভাষা-ভাষী সকল আহমদীকে এ পুস্তকের আলোকে সত্যিকার আহমদী হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ পুস্তকখানি আমরা সকলের হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছি আল্লাহ্তাআলা তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

১৩ জানুয়ারী, ১৯৯৯ইং

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

১। খোদাতাআলা ৫

২। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালাম ৭

৩। কুরআন করীম ৮

৪। সত্য ধর্ম কেবল মাত্র ইসলাম ৯

৫। পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিষ্ঠার সহিত আদায় করা ১২

৬। নিজেদের রোযা খোদার জন্য সততার সহিত পূর্ণ কর ১৪

৭। যাহারা যাকাত দেওয়ার যোগ্য তাহারা যাকাত দিবে ১৪

৮। যাহার উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে এবং কোন বাধা-নিষেধ নাই সে হজ্জ করিবে ১৫

৯। কাযা ও কদর (অমোঘ নিয়তি) ১৬

১০। পরকালে বিশ্বাস ১৬

১১। ফিরিশ্‌তাদের উপর ঈমানের রহস্য ১৭

১২। বেহেশ্‌ত ও দোযখ্‌ ১৮

১৩। প্রত্যেক পুণ্যের শিকড় তাকওয়া (খোদা-ভীতি) ২০

১৪। মুত্তাকীর সংজ্ঞা ও ঈমানের দর্শন ২০

১৫। দোয়া ২৩

১৬। 'তদবীর' (প্রচেষ্টা) ও দোয়া ২৪

১৭। ইসলামে এই নবুওয়তের দরজা বন্ধ যাহা স্বীয় প্রভাব খাটায় ২৫

১৮। মসীহ্‌ নাসেরী আলায়হেস সালামের মৃত্যু ২৭

১৯। মসীহ্‌ মাওউদ ও মাহদী মা'হূদ ২৯

২০। বয়াতের তাৎপর্য ৩০

২১। পরীক্ষা ৩১

২২। আহমদীয়তের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ৩২

২৩। ধর্মকে দুনিয়ার উপর অগ্রগণ্য কর ৩৩

২৪। পাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার পন্থা কেবলমাত্র 'কামেল একীন' (পরিপূর্ণ বিশ্বাস) ৩৪

বিষয় পৃষ্ঠা

২৫। ইস্তেগফার ৩৫

২৬। পুণ্যবানগণের সাহচর্য ৩৬

২৭। পুণ্যবানগণের সাহচর্যের প্রয়োজনীয়তা ৩৬

২৮। আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সাহচর্য অত্যাবশ্যক ৩৬

২৯। সন্তানদের 'তরবীয়ত' (ধর্মীয় প্রশিক্ষণ) ৩৭

৩০। ওয়াকফে জিন্দেগী (জীবন উৎসর্গীকরণ) ৩৮

৩১। উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী ৩৯

৩২। সত্যবাদিতা ৪০

৩৩। আনুগত্য ৪১

৩৪। ন্যায়-বিচার ও উপকার—অতি নিকট আত্মীয়সুলভ আচরণ ৪২

৩৫। ধৈর্য ৪৩

৩৬। (খোদার উপর) ভরসা ৪৪

৩৭। ক্ষমা ও মার্জনা এবং পারস্পরিক ভালবাসা ৪৫

৩৮। অধীনস্থ ও গরীবের উপর দয়া ৪৬

৩৯। প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার ৪৬

৪০। সহানুভূতি ৪৬

৪১। মেহমাননেওয়াযী (অতিথিপরায়ণতা) ৪৮

৪২। মন্দ চরিত্র ৪৮

৪৩। মিথ্যা ৪৯

৪৪। 'রিয়া' (লোক দেখানো কাজ ও কথা) ৫০

৪৫। কুধারণা ৫০

৪৬। অহংকার ৫২

৪৭। কুৎসা ৫৪

৪৮। কু-সংসর্গ ৫৫

৪৯। হিংসা ৫৫

৫০। কে আমার অন্তর্ভুক্ত ? ৫৬

بسم الله الرحمن الرحيم

আহমদীয়া জামাতের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে একজন আদর্শ আহমদী

খোদাতাআলা

“আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশ্‌ত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা, আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়, তবুও ইহা ক্রয় করা উচিত। হে (খোদালাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস যাহা তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে। আমি কী করিব এবং কী উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব ? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া বাজারে বন্দরে ঘোষণা করিব যে, ‘ইনি তোমাদের খোদা’ এবং কোন্ ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করিব যাহাতে শুনিবার জন্য তাহাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয় ” (কিশ্‌তিয়ে নূহ্, পৃষ্ঠা-৪৪) ?

“অনুসরণের জন্য যাহা অবশ্য কর্তব্য তাহা এই ঃ তাহাদিগকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, তাহাদের এক কাদের (সর্বশক্তিমান), কাইয়্যুম (চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণকারী) এবং খালেকুল–কুল (সর্বস্রষ্টা) খোদা আছেন যিনি আপন গুণাবলীতে অনাদি, অনন্ত এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি কাহারও পুত্র নহেন এবং কেহ তাঁহার পুত্র নহে। দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা, ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া এবং মৃত্যু হইতে তিনি মুক্ত। তিনি এইরূপ এক অস্তিত্ব যে, দূরে থাকিয়াও তিনি নিকটে এবং নিকটে থাকিয়াও দূরে। তিনি একক হইলেও তাঁহার জ্যোতির বিকাশ বিভিন্ন। মানুষের মধ্যে যখন এক অভিনব পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় তখন তিনি তাহার জন্য এক নূতন খোদা হইয়া যান এবং নূতন এক দীপ্তি সহকারে তাহার সঙ্গে ব্যবহার করেন। মানুষ নিজের পরিবর্তনের অনুপাতে খোদাতাআলার মধ্যেও এক পরিবর্তন দেখিতে পারে; কিন্তু এমন নহে যে, খোদার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়, বরং তিনি আদিকাল হইতে অপরিবর্তনীয় এবং পরিপূর্ণতার অধিকারী। কিন্তু মানবীয় পরিবর্তনের সময়ে যখন মানুষের পরিবর্তন পুণ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন খোদাও এক নূতন জ্যোতিতে তাহার নিকট প্রকাশিত হন।

মানুষের প্রত্যেক উন্নতিপ্রাপ্ত অবস্থার বিকাশের সময় খোদাতাআলার শক্তিমত্তার জ্যোতিও এক উন্নততর আকারে প্রকাশিত হয়। যেখানে অসাধারণ পরিবর্তনের বিকাশ ঘটে সেখানেই তিনি অসাধারণ কুদরত প্রদর্শন করেন। অলৌকিক লীলা ও মো'জেযার মূল ইহাই। এইরূপ খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই আমাদের সেলসেলার শর্ত। তাঁহার উপর বিশ্বাস কর এবং নিজ প্রাণ, আরাম এবং তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ের উপর তাঁহাকে প্রাধান্য দাও এবং কার্যতঃ বীরত্বের সহিত তাঁহার পথে সততা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন কর। জগদ্বাসী তাহাদের সম্পদ ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর খোদাকে প্রাধান্য দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে প্রাধান্য দাও যাহাতে আকাশে তোমরা তাঁহার জামাতভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পার" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্‌, পৃষ্ঠা-২১, ২২)।

"খোদার সহিত অন্য কোন বস্তুকে কখনো অংশীদার সাব্যস্ত করিবে না। খোদার অংশীদার সাব্যস্ত করা ভয়ানক যুলুম" (রূহানী খাযায়েন-প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫২১ হাশিয়া দর হাশিয়া)।

"মনে রাখিও শের্‌ক (আল্লাহ্‌র সহিত অংশীদারীত্ব) কয়েক প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথমতঃ সাধারণভাবে প্রতিমা পূজা, গাছপালা ইত্যাদির পূজা করা। ইহা সব চাইতে সাধারণ ও মোটা ধরনের শের্‌ক। উপকরণের উপর সীমার অধিক ভরসা করা দ্বিতীয় প্রকারের শের্‌ক। যেমন এই কথা বলাও শের্‌ক যে, যদি অমুক কাজ না হইত আমি ধ্বংস হইয়া যাইতাম। খোদাতাআলার সত্তার মোকাবেলায় নিজের সত্তাকেও কোন কিছু মনে করা তৃতীয় প্রকারের শের্‌ক। এই প্রগতি ও জ্ঞানের যুগে আজকাল কেউ মোটা ধরনের শের্‌কে গ্রেফতার হয় না। অবশ্য জড় উন্নতির যুগে উপকরণ সম্পর্কিত শের্‌ক অনেক বাড়িয়া গিয়াছে" (মলফুযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৮৭ ও ২৮৮)।

"প্রত্যেক পাপ ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা ব্যতীত অন্য কাহাকেও কার্যনির্বাহী উপাস্য মনে করা ক্ষমার অযোগ্য পাপ। 'ইন্নাশ্‌ শেরকা লা যুলমুন আযীম লা ইয়াগফিরু আনইয়ুশ্‌রাকা বিহী' (অর্থ ঃ নিশ্চয় শের্‌ক বড় একটি যুলুম। তাঁহার সঙ্গে শরীক করা তিনি ক্ষমা করেন না – অনুবাদক)। এখানে শের্‌কের অর্থ ইহা নহে যে, পাথর প্রভৃতির পূজা করা হইবে ; বরং উপকরণের পূজা করা ও পৃথিবীর উপাস্যদের উপর জোর দেওয়া একটি শের্‌ক। ইহারই নাম শের্‌ক। পাপের দৃষ্টান্ত হুক্কার ন্যায়। ইহা ছাড়িয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কষ্টই বা মুশ্‌কিল দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু শের্‌কের দৃষ্টান্ত আফিম এর ন্যায়। ইহা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং ইহা পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন" (মলফুযাত, ষষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১৮ ও ১৯)।

"স্মরণ রাখ শের্‌ক কয়েক প্রকারের হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে একটিকে প্রকাশ্য শের্‌ক ও অন্যটিকে গুপ্ত শের্‌ক বলা হয়। প্রকাশ্য শের্‌কের দৃষ্টান্ত সাধারণভাবে ইহাই যেরূপে প্রতিমা পূজারী লোকেরা প্রতিমাকে, বৃক্ষকে বা অন্যান্য বস্তুকে উপাস্য মনে করে। গুপ্ত শের্‌ক এই যে, মানুষ কোন বস্তুর সম্মান এভাবে যেভাবে আল্লাহ্‌তালাকে করে, বা করা উচিত, বা কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌তাআলার ন্যায় ভালবাসে, বা ইহাকে ভয় করে, বা ইহার উপর ভরসা করে" (মলফুযাত, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১৪)।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম

"ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতাআলা তোমাদের নিকট যাহা চান তাহা এই যে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ্ এক, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার নবী এবং খাতামাল আম্বিয়া ও সকল নবী হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রতিচ্ছায়ারূপে মুহাম্মদীয়তের চাঁদর যাহাকে পরানো হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কোন নবী তাঁহার পরে আসিবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কান্ড হইতে পৃথক নহে" (কিশ্তিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা - ৩৩)।

"সকল আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভিন্ন কোন রসূল ও শাফী (সুপারিশকারী) নাই। অতএব, তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন ও প্রতাপশালী নবীর সহিত সত্যিকার প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পার। স্মরণ রাখিও, মুক্তি সেই জিনিষের নাম নহে যাহা মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইবে, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহাই যাহা এই দুনিয়াতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া থাকে। মুক্তিপ্রাপ্ত কে ? সেই ব্যক্তি, যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার ও তাঁহার সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যবর্তী 'শাফী' এবং আকাশের নীচে তাঁহার সমমর্যাদাবিশিষ্ট অন্য কোন রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কাহাকেও খোদাতাআলা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু এই মনোনীত নবী চিরকালের জন্য জীবিত"(কিশ্তিয়ে নূহ্ পৃষ্ঠা-২৮ ও ২৯)।

"যখন আমরা ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে দেখি তখন সমগ্র নবুওয়তের সিলসিলায় সব চাইতে উচ্চ স্তরের নবী, জীবন্ত নবী ও খোদার সব চাইতে প্রিয় নবীরূপে কেবল একজন মানুষকেই জানি, অর্থাৎ তিনিই নবীগণের নেতা, রসূলগণের গর্ব ও সকল রসূলের মাথার মুকুট, যাঁহার নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা ও আহমদ মুজতবা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। তাঁহার ছায়ার নীচে দশ দিন চলিলে ঐ জ্যোতিঃ লাভ করা যায়, যাহা ইহার পূর্বে হাজার বৎসর পর্যন্ত লাভ করা যাইত না। . . . . অতএব শেষ উপদেশ ইহাই যে, আমি প্রত্যেক জ্যোতিঃ রসূল উম্মী নবীর অনুবর্তিতার মাধ্যমে লাভ করিয়াছি এবং যে ব্যক্তি অনুবর্তিতা করিবে সে-ও লাভ করিবে। সে এইরূপ কবুলিয়ত লাভ করিবে যে, তাহার সম্মুখে কোন কিছু অসম্ভব রহিবে না। জীবন্ত খোদা, যিনি লোকদের নিকট গুপ্ত, তিনি তাহার খোদা হইবেন এবং সকল মিথ্যা খোদা তাহার পায়ের নীচে পিষ্ট হইয়া যাইবে। সে সকল জায়গায় মুবারক হইবে এবং খোদার শক্তি তাহার সাথে থাকিবে।

"ওয়াস্সালামু 'আলা মানিত্তাবায়াল হুদা" (অর্থ ঃ – শান্তি বর্ষিত হউক ঐ ব্যক্তির উপর যে হেদায়াতের অনুসরণ করে-অনুবাদক)"(সীরাজুম মুনীর পৃষ্ঠা-৮০ কাদিয়ান থেকে ১৯১০ সনে মুদ্রিত)।

কুরআন করীম

যাহারা কুরআনকে সম্মান করিবে তাহারা আকাশে সম্মান লাভ করিবে

"তোমাদের প্রতি আর এক অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ এই যে, কুরআন শরীফকে এক অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের মত পরিত্যাগ করিও না। কারণ কুরআনেই তোমাদের জীবন রহিয়াছে। যাহারা কুরআনকে সম্মান করিবে, তাহারা আকাশেও সম্মান লাভ করিবে। যাহারা সকল হাদীসের উপর কুরআনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইবে। মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মশাস্ত্র নাই" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা-২৮, ডিসেম্বর, ১৯৫২ তে রাবওয়া হইতে মুদ্রিত)।

"সর্বপ্রথম কুরআন শরীফে খোদাতাআলার তৌহীদ (একত্ববাদ), গৌরব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত মতভেদের মীমাংসা করা হইয়াছে যাহা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ঈসা ইবনে মরিয়মকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করা হয় আর তিনি অভিশপ্ত এবং অন্যান্য নবীগণের ন্যায় তাহার 'বাকা' (আধ্যাত্মিক উন্নতি) হয় নাই – তাহাদের এই মতভেদ ও ভ্রান্তির মীমাংসা করা হইয়াছে। তদ্রূপ কুরআন শরীফে তোমাদিগকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন বস্তুর উপাসনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা কোন মানুষই হউক বা পশুই হউক, চন্দ্র-সূর্য বা কোন নক্ষত্রই হউক, কোন উপায় -উপকরণ কিংবা তোমাদের ব্যক্তিত্বই হউক। সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং খোদাতাআলার শিক্ষা ও কুরআনের হেদায়াতের বিরুদ্ধে এক পা-ও অগ্রসর হইও না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সব গ্রন্থই ইহার প্রতিচ্ছবি ছিল। সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সহিত অতি গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারো সাথে তোমরা কর নাই। কেননা, খোদাতাআলা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, আল্ খয়রু কুল্লুহূ ফিল কুরআন অর্থাৎ "সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত আছে", একথাই সত্য। আফসোস ঐ সকল লোকদের জন্য, যাহারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস। তোমাদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা কুরআন শরীফে পাওয়া যায় না। কেয়ামতের দিবসে কুরআন শরীফই তোমাদের ঈমানের সত্যাসত্যের মানদন্ড হইবে। কুরআন শরীফ ব্যতীত আকাশের নীচে অন্য কোন গ্রন্থ্ নাই যাহা কুরআন শরীফের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া তোমাদিগকে 'হেদায়াত' দান করিতে পারে। খোদাতাআলা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ্ তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্ত তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। এই যে হেদায়াত এবং নেয়ামত তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে, তাহা যদি ইহুদীদিগকে তওরাতের

বদলে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের কোন কোন ফের্‌কা কেয়ামতের অস্বীকারকারী হইত না বা অলৌকিকত্বের অস্বীকারকারী হইত না। সুতরাং তোমরা এই নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত। ইহা এক মহা সম্পদ। যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত তাহা হইলে দুনিয়া এক অপবিত্র মাংস পিন্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কুরআন শরীফ এমন একখানা ধর্মগ্রন্থ, যাহার তুলনায় অন্য সকল হেদায়াতই তুচ্ছ" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা ৫২-৫৫, মুদ্রণ -১৯৫২)।

"আমি এই কথার সাক্ষী এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি এই সত্য, যাহা খোদা পর্যন্ত পৌঁছায়, কুরআন হইতে পাইয়াছি। আমি ঐ খোদার আওয়াজ শুনিয়াছি এবং তাঁহার শক্তিশালী বাহুর নিদর্শন দেখিয়াছি, যিনি কুরআন প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আমি বিশ্বাস আনিয়াছি যে, তিনিই সত্য খোদা এবং নিখিল বিশ্বের মালিক। আমার হৃদয় এই বিশ্বাসে এইরূপ ভরপুর, যেভাবে সমুদ্রের মাটি পানি দ্বারা ভরপুর। অতএব আমি অন্তর্দৃষ্টির পথ হইতে এই ধর্ম ও এই জ্যোতির দিকে সকলকে আহ্বান জানাইতেছি। আমি এই প্রকৃত জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছি, যদ্বারা অন্ধকারের পরদা সরিয়া যায় এবং 'গয়ের উল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু) হইতে হৃদয় ঠান্ডা হইয়া যায়। ইহাই একটি পথ যদ্বারা মানুষ প্রবৃত্তির আবেগ ও অন্ধকার হইতে এইরূপে বাহির হইয়া আসে, যেরূপে সাপ উহার খোলস হইতে বাহির হইয়া আসে" (রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৩, কেতাবুল বারীয়া পৃঃ ৬৫)।

"যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। কুরআন শরীফ সর্ব প্রথমেই পাঠককে এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছে এবং এই আশ্বাস দিয়াছে যে, "ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাতাল মুস্তাকীম সিরাতাল্লাযীনা আনআম্‌তা আলায়হিম" অর্থাৎ আমাদিগকে সেই পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর যাহা পূববর্তীগণকে প্রদর্শন করা হইয়াছে, যাহারা নবী, রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্‌ ছিলেন। অন্য কোন ধর্ম-গ্রন্থ এই শিক্ষা দেয় নাই। নিজেদের সাহস বৃদ্ধি কর এবং কুরআন শরীফের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করিও না, কারণ ইহা তোমাদিগকে ঐ সকল আশীষ প্রদান করিতে চায় যাহা তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে প্রদান করা হইয়াছিল" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্‌, পৃঃ ৫৫ ও ৫৬, ১৯৫২ সনে মুদ্রিত)।

সত্য ধর্ম কেবল মাত্র ইসলাম

"হে জগতের সকল মানুষ ! হে সকল মানুষের আত্মা যাহারা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বসবাস কর! আমি সম্পূর্ণ জোরের সহিত তোমাদিগকে এই দিকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি যে, এখন জগতে সত্য ধর্ম কেবলমাত্র ইসলাম এবং সত্য খোদাও ঐ খোদাই যাহা কুরআন বর্ণনা করিয়াছে এবং সর্বকালের আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী নবী এবং প্রতাপ ও পবিত্রতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নবী হইলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন এবং পবিত্র ও প্রতাপ সম্পর্কে আমি এই প্রমাণ পাইয়াছি যে, তাঁহার অনুবর্তিতা ও ভালবাসার মাধ্যমে আমি 'রূহুল কুদুস' ও

খোদার সহিত বাক্যালাপ এবং আসমানী নিদর্শনাবলীর পুরস্কার পাইতেছি" (তরিয়াকুল কুলুব পৃঃ ১১ ও ১২)।

"জানা প্রয়োজন, অগ্রিমরূপে একটি বস্তুর মূল্য দেওয়া, এবং / অথবা কাহাকেও নিজের কাজ সোর্পদ করা, এবং / অথবা সন্ধির অন্বেষণকারী হওয়া, এবং / অথবা কোন বিষয় বা ঝগড়া পরিত্যাগ করাকে আরবী অভিধানে ইসলাম বলা হয়।

ইসলামের পারিভাষিক অর্থ উহা, যাহা এই আয়াতে করীমায় ইঙ্গিত আছে, অর্থাৎ বালা মান আসলামা ওয়াজহাহূ লিল্লাহ ওয়া হুয়া মুহ্‌সিনুন ফালাহূ আজরুহূ ইন্দা রব্বিহী ওয়ালা খওফুন আলায়হিম ওয়ালা হুম ইয়াহ্‌যানূন"। অর্থাৎ মুসলমান সে, যে খোদাতাআলার পথে তাহার পূর্ণ সত্তা সোপর্দ করে, অর্থাৎ নিজ সত্তাকে আল্লাহ্‌তাআলার জন্য এবং তাহার ইচ্ছার অনুবর্তিতা করার জন্য এবং তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত সে পুণ্য কাজে খোদাতাআলার জন্য কায়েম হইয়া যায় এবং নিজ সত্তার সকল কার্যকর শক্তি তাঁহার পথে নিয়োগ করে। ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও আমল এর দিক হইতে সে কেবলমাত্র খোদাতাআলার হইয়া যায়।

বিশ্বাসের দিক হইতে ইসলামের অর্থ এইরূপ যে, নিজের পূর্ণ সত্তাকে প্রকৃতপক্ষে এইরূপ একটি বস্তু মনে করা যাহা খোদাতাআলাকে সনাক্তকরণ, তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতা, তাঁহার প্রেম ও ভালবাসা ও তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বানানো হইয়াছে। আমলের দিক হইতে ইসলামের অর্থ এইরূপ যে, যথার্থ পুণ্য কাজ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য সম্পাদন করিবে, যাহা প্রত্যেকটি শক্তি ও খোদাপ্রদত্ত তওফীকের সহিত সম্পৃক্ত। কিন্তু এইরূপ আগ্রহ-উদ্দীপনা ও উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিতে হইবে যেন সে নিজের আনুগত্যের আয়নায় তাহার প্রকৃত উপাস্যের চেহারা দেখিতেছে"(আয়নায়ে কামালতে ইসলাম পৃঃ ৫৭ ও ৫৮, রূহানী খাযায়েন খন্ড ৫)।

"ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, নিজ ঘাড় খোদার সম্মুখে কুরবানীর ছাগলের ন্যায় রাখিয়া দেওয়া, নিজের সকল কামনা–বাসনা বিসর্জন দেওয়া, খোদার ইচ্ছায় ও সন্তুষ্টিতে বিলীন হইয়া যাওয়া, খোদার মধ্যে হারাইয়া গিয়া নিজের উপর এক মৃত্যু ডাকিয়া আনা, তাঁহার ব্যক্তিগত ভালবাসা হইতে পূর্ণ রঙ অর্জন করিয়া কেবল ভালবাসার আবেগে তাঁহার আনুগত্য করা এবং না অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে, এইরূপ চক্ষু লাভ করা যাহা কেবল খোদার সাথে দেখে, এইরূপ কান লাভ করা যাহা কেবল তাঁহার সহিত শোনে, এইরূপ হৃদয় সৃষ্টি করা যাহা সরাসরি তাঁহার দিকে অবনত, এবং এইরূপ মুখ লাভ করা যাহা তিনি বলিতে আদেশ দিলে বলে। ইহা ঐ অবস্থান যেখানে সকল গমন শেষ হইয়া যায় এবং মানবীয় শক্তি উহার জিম্মায় ন্যস্ত সকল কাজ করিয়া ফেলে ও সম্পূর্ণরূপে মানুষের প্রবৃত্তির উপর মৃত্যু নামিয়া আসে। এমতাবস্থায় খোদাতাআলার করুণা নিজের জীবন্ত 'কালাম' (কথা) ও দীপ্ত জ্যোতির সহিত পুনরায় তাহাকে জীবন দান করে এবং সে খোদার সুস্বাদু কথার দ্বারা সম্মানিত হয়, এবং ঐ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর জ্যোতিঃ যাহা জ্ঞান-বুদ্ধি আবিষ্কার করিতে পারে না এবং চক্ষু উহার ধারে কাছেও পৌঁছিতে পারে না, উহা স্বয়ং মানুষের হৃদয়ের নিকটবর্তী হইয়া যায়, যেমন খোদা বলেন, নাহনু আকরাবু ইলায়হে মিন হাবলিল ওয়ারীদ অর্থাৎ আমি তাহার জীবন শিরা হইতেও তাহার অধিক নিকটবর্তী" (রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২০ পৃঃ ১৬০)।

“মুসলমান সে, যে খোদাতাআলার পথে নিজের পূর্ণ সত্তাকে সঁপিয়া দেয় এবং পুণ্য কাজে খোদাতাআলার জন্য কায়েম হইয়া যায়, যেন তাহার শক্তি খোদাতাআলার জন্য মরিয়া যায়, যেন সে তাঁহার পথে যবাই হইয়া যায়, যেরূপে ইব্রাহীম আলায়হেস সালাম এই ইসলামের নমুনা দেখাইয়াছেন যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা পূর্ণ করিতে গিয়া নিজের প্রবৃত্তিকে সামান্য অধিকারও দেন নাই এবং একটি সামান্য ইঙ্গিতে পুত্রকে যবাই করা শুরু করিয়া দিলেন” (মুলফুযাত, খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৫ ও ১৭৬)।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” একটি কথা। ইহার আমলী প্রমাণ “বালা মান আসলামা ওয়াজ্হাহূ লিল্লাহি ওয়া হুয়া মুহ্সিনূন” (সূরা বাকারা – আয়াত ১১৩) – অর্থঃ যে কেহ আল্লাহ্র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয় –অনুবাদক)। শুধু কথা (ঈমানের দাবী) কোন কাজের নহে এবং না উহা কোন উপকারে আসিতে পারে। শুষ্ক ঈমান-এর দৃষ্টান্ত একটি পালকবিহীন মোরগ এর ন্যায় যাহা একটি মাংস-পিন্ড, যাহা না চলা ফেরা করিতে পারে, না ইহার মধ্যে উড়ার শক্তি আছে। বরং ইসলাম ইহাকে বলা হয় যে, মানুষ ভয়াবহ দৃশ্য দেখা সত্ত্বেও এবং এই বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও যে, এই জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকাই যেন জীবনকে বিপদগ্রস্থ করা, তথাপি খোদার পথে মাথা পাতিয়া দেয়, খোদার পথে নিজের কোন লোকসানের পরোয়া করে না। যুদ্ধের সময়ে সিপাহী জানে যে, আমি মৃত্যুর মুখে যাইতেছি এবং জীবন্ত চলাফেরার তুলনায় সে মৃত্যুকে নিশ্চিত বলিয়া দেখে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও সে তাহার অফিসারের আজ্ঞানুবর্তিতায় ও বিশ্বস্ততায় সম্মুখেই অগ্রসর হয় এবং কোন বিপদের পরোয়া করে না। ইহার নাম ইসলাম। মোটকথা, একটি বাক্যে (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) আল্লাহ্তাআলার তৌহীদ’ (আল্লাহ্র একত্ববাদ ও অংশীদারবিহীনত্ব) শিখাইয়াছেন এবং দ্বিতীয়টিতে (মান আসলামু ওয়াজহাহূ লিল্লাহ্) শিখাইয়াছেন যে, এই তৌহীদের উপর খাঁটি ও জীবন্ত ঈমানের প্রমাণ নিজের কর্ম দ্বারা দাও এবং খোদার পথে নিজের গর্দান পাতিয়া দাও” (মলফুযাত, দশম খন্ড, পৃঃ ৪০৭ ও ৪০৮)।

“খাটি ইসলাম ইহাই যে, আল্লাহ্তাআলার পথে নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও সারা জীবন উৎসর্গ কর যেন পবিত্র জীবনের উত্তরাধিকারী হও। বস্তুতঃ স্বয়ং আল্লাহ্তাআলা এই ‘লিল্লাহী ওয়াক্ফ’ (আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করণ) এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, “বালা মান আসলামা ওয়াজহাহূ লিল্লাহি ওয়া হুয়া মুহসিনুন ফালাহূ আজরুহূ ইন্দা রব্বিহী ওয়ালা খওফুন আলায়হিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানূ” (সূরা – আল্ বাকারা আয়াত – ১১৩)। অর্থ ঃ – যে কেহ আল্লাহ্র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয় সেক্ষেত্রে তাহার জন্য তাহার প্রভুর নিকট প্রতিদান রহিয়াছে। এবং না তাহাদের উপর কোন ভয় আসিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে – অনুবাদক)। এ স্থলে আসলামা ওয়াজহাহূ লিল্লাহি-এর অর্থ ইহাই যে, এক অনস্তিত্বের ও পরম বিনয়ের পোষাক পরিধান করিয়া খোদার আস্তানায় অবনত হও এবং নিজের জীবন, ধন-সম্পদ, সম্মান, মোট কথা যাহা কিছু তোমার নিকট আছে খোদার জন্যই উৎসর্গ কর এবং পৃথিবী ও উহার সকল বস্তুকে ধর্মের দাস বানাও। ইহাতে কেহ যেন মনে না করে যে, মানুষ পৃথিবীর সহিত কোন সম্পর্ক ও সংশ্রবই রাখিবে না। আমার বলার উদ্দেশ্য ইহা নহে এবং না আল্লাহ্তাআলা দুনিয়া অর্জন করিত নিষেধ করিয়াছেন বরং ইসলাম বৈরাগ্য নিষেধ করিয়াছে। ইহা ভীরুদের কাজ। মু’মিনের সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে যতখানি বিস্তৃত

হয় সে ততখানি ইহার উচ্চ মার্গের কারণ হইয়া থাকে। কেননা, তাহার লক্ষ্য-বস্তু হইল ধর্ম। এবং দুনিয়া ও ইহার ধন-সম্পদ ধর্মের দাস হইয়া থাকে। অতএব আমার কথা এই যে, দুনিয়া নিজেই লক্ষ্য-বস্তু হওয়া উচিত নহে; বরং দুনিয়া অর্জনের আসল উদ্দেশ্য হইল ধর্ম এবং এইভাবে দুনিয়াকে অর্জন করিতে হইবে যেন উহা ধর্মের দাস হইয়া যায়, যেরূপে মানুষ কোন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়ার লক্ষ্যে সফরের জন্য বাহন বা / এবং পাথেয় সঙ্গে নিয়া নেয়। তাহার আসল উদ্দেশ্য গন্তব্যস্থলে পৌছানো, না বাহন ও পথের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী। এইভাবে ধর্মের দাস মনে করিয়া মানুষকে দুনিয়া অর্জন করিতে হইবে"(মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩৬৪ ও ৩৬৫ নূতন এডিশন)।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিষ্ঠার সহিত আদায় করা

"যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিষ্ঠার সহিত আদায় করে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৮)।

"নিজের পাঁচ ওয়াক্ত নামায এইরূপ ভীতি সহকারে ও নিবিষ্ট চিত্তে পড়িবে যেন তোমরা খোদাতাআলাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছ" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩০ ও ৩১)।

"নামায কী ? ইহা ইহল দোয়া, যাহা 'তসবীহ্' (মহিমা কীর্তন) 'তাহ্‌মীদ' (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), 'তকদীস' (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং 'ইস্তেগফার' (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া শক্তি প্রার্থনা) ও 'দরূদ' সহ (অর্থাৎ হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর জন্য আশিস কামনা করতঃ) সবিনয়ে প্রার্থনা। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন দোয়ার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকিও না। কারণ তাহাদের নামায এবং 'ইস্তেগফার' সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র যাহাতে কোন সারবস্তু নাই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড় তখন খোদাতাআলার কালাম কুরআনে এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কালামে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজেদের ভাষাতেই কর। নিবেদন জানাও যেন সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়। ------- নামাযে ভাবী বিপদের প্রতিকার রহিয়াছে। তোমরা অবগত নহ যে, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্য কী নিয়তি আনয়ন করিবে। সুতরাং দিবসের উদয়ের পূর্বেই তোমরা তোমাদের মাওলার সমীপে সবিনয় নিবেদন কর যেন তোমাদের জন্য মঙ্গল ও আশিসপূর্ণ দিবস আগমন করে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ১১৭, ১১৮ ও ১২০)।

"নামায কী ? নামায প্রকৃতপক্ষে 'রব্বুল ইজ্জত' এর নিকট দোয়া, যাহা ব্যতীত মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না, না ভাল থাকার ও খুশীর উপকরণ লাভ করা যাইতে পারে। যখন খোদাতাআলা তাহার উপর স্বীয় 'ফযল' (আশিস) করিবেন, তখন সে প্রকৃত খুশী ও আনন্দ লাভ করিবে। তখন হইতে সে নামাযে স্বাদ ও আনন্দ পাইতে আরম্ভ করিবে। যেভাবে সুস্বাদু খাদ্য আহার করিলে মজা লাগে, এইভাবেই রোদন ও কান্নাকাটিতে মজা আসিবে। নামাযের এই যে অবস্থা, ইহা তখনই সৃষ্টি হইয়া যাইবে। ইহার পূর্বে স্বাস্থ্য লাভের জন্য মানুষ যেভাবে তিক্ত ঔষধ খায়, সেভাবে এই বিস্বাদ নামায পড়া ও দোয়া চাওয়া জরুরী। এই বিস্বাদের অবস্থায় এই কথা মনে করিয়া যে, ইহাতে স্বাদ ও মজা সৃষ্টি হইবে, এই দোয়া কর, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দেখিতেছ

আমি কীরূপ অন্ধ ও চক্ষুহীন। আমি এখন সম্পূর্ণরূপে মৃত অবস্থায় আছি। আমি জানি অল্প কিছুক্ষণ পর আমার ডাক আসিবে। তখন আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিব। তখন আমাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। কিন্তু আমার হৃদয় অন্ধ ও অজ্ঞ। তুমি ইহার ওপর এইরূপ জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ অবতীর্ণ কর যেন ইহাতে তোমার আসক্তি ও ভালবাসা সৃষ্টি হইয়া যায়। তুমি এইরূপ ফযল কর যেন আমি অন্ধ হইয়া না উঠি এবং অন্ধদের সহিত গিয়া মিলিত না হই। যখন এই ধরনের দোয়া ভিক্ষা করিবে এবং ইহাতে সব সময় লাগিয়া থাকিবে তখন তুমি দেখিবে যে, তোমার উপর একটি সময় আসিবে যখন এই বিস্বাদের নামাযে একটি বস্তু আকাশ হইতে তোমার উপর পড়িবে যাহা আবেগ সৃষ্টি করিয়া দিবে" (আল্ হাকাম, খন্ড ৭ তারিখ ঃ ১০ জানুয়ারী, ১৯০৩ খৃঃ, পৃঃ ১১)।

"নামায পড়। নামায পড়। ইহা সকল সৌভাগ্যের চাবি। যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন এইরূপ করিও না, যেন একটি আচার-অনুষ্ঠান পালন করিতেছ। বরং নামাযের পূর্বে যেভাব এক বাহ্যিক ওযূ কর, তেমনিভাবে এক অভ্যন্তরীণ ওযূ কর এবং নিজের শরীরের অঙ্গ হইতে 'গয়ের উল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু)-এর ধারণা ধুইয়া ফেল। তারপর এই দুইটি ওযূর সহিত দাঁড়াইয়া যাও। নামাযে অনেক দোয়া কর এবং কান্নাকাটি করা ও কোঁকাইয়া কাঁদা নিজের অভ্যাসে পরিণত কর, যাহাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়" (রূহানী খাযায়েন, খন্ড ৩, পৃঃ -৫৪৯)।

"ইবাদত প্রকৃতপক্ষে ইহাকে বলে যে, মানুষ সকল প্রকারের কাঠিন্য ও বক্রতা দূর করিয়া হৃদয়ের জমিকে এইরূপ পরিষ্কার করিবে, যেভাবে কৃষক জমিকে পরিষ্কার করে। আরববাসীরা বলে, 'মাত্তরুন মু'আব্বাদুন' যেভাবে সুরমাকে মিহি করিয়া চোখে লাগানোর উপযুক্ত করিয়া নেওয়া হয়। তদ্রূপেই যখন হৃদয়ের জমিতে কোন কাঁকর, পাথর, আবর্জনা না থাকে এবং এইরূপ পরিষ্কার হয় যেন আত্মাও কেবল আত্মাই অবশিষ্ট থাকে তখন ইহার নাম হয় ইবাদত। যদি আয়নাকে এইরূপ সাফ-সুতরা ও পরিষ্কার করা হয় তবে ইহাতে চেহারা দেখা যায়। যদি জমিকে এইভাবে সাফ-সুতরা করা হয় তবে ইহাতে বিভিন্ন প্রকারের ফল উৎপন্ন হয়। অতএব মানুষ, যাহাকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, সে যদি হৃদয়কে পরিষ্কার করে এবং উহাতে কোন প্রকারের বক্রতা, ময়লা, কাঁকর ও পাথর না থাকিতে দেয় তবে ইহার মধ্যে খোদা দৃষ্টিগোচর হইবে। আমি আবার বলিতেছি, আল্লাহ্তাআলার ভালবাসার বৃক্ষ হইতে সৃষ্টি হইয়া বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকিবে এবং ঐ সুমিষ্ট ও পবিত্র ফল ইহাতে লাগিবে, যাহা উকুলাহা দায়েমুন (অর্থ ঃ – যাহার ফল চিরস্থায়ী-অনুবাদক)-এর প্রতীক হইবে। স্মরণ রাখ, ইহাই ঐ মকাম যেখানে সুফীদের পুণ্যকর্মের পরিসমাপ্তি হয়। যখন পুণ্যবান ব্যক্তি এখানে পৌঁছিয়া যায় তখন কেবল খোদারই জ্যোতির্বিকাশ দেখে। তাহার হৃদয় খোদার আরশ হইয়া যায় এবং আল্লাহ্তাআলা তাহার ওপর অবতীর্ণ হন। পুণ্যকর্মের সকল গন্তব্যস্থল এখানে আসিয়া শেষ হইয়া যায় যেখানে মানুষের উপাসনার অবস্থা সঠিক হয়, যেখানে আধ্যাত্মিক বাগান তৈরি হইয়া যায় এবং আয়নার ন্যায় খোদা দৃষ্টিগোচর হন। এই মকামে পৌঁছিয়া মানুষ পৃথিবীতে জান্নাতের নমুনা লাভ করে এবং এখানেই হাযাল্লাযী রুযিক্বনা মিন ক্বলু ওয়া উতুবিহী মুতাশাবিহা (সূরা – আল্ বাকারা, আয়াত ২৬, অর্থ ঃ ইহাতো সেই রিযক যাহা আমাদিগকে ইহার পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাহাদিগকে উহার অনুরূপও দেওয়া হইবে – অনুবাদক) বলার স্বাদ ও মজা উপভোগ করে। মোট কথা, উপাসনার অবস্থা সঠিক করার নাম ইবাদত" (আল্ হাকাম, খন্ড ৬, তারিখ ২৪ জুলাই, ১৯০৩, পৃঃ ৯ ও ২৬)।

নিজেদের রোযা খোদার জন্য সততার সহিত পূর্ণ কর

[কিশতিয়ে – নূহ, পৃঃ ৩১]

“তৃতীয় বিষয়, যাহা ইসলামের মূল ভিত্তি, তাহা হইল রোযা। রোযার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কেও মানুষ অনবহিত। প্রকৃত কথা এই যে, যে দেশে মানুষ যায় না এবং যে জগৎ সম্পর্কে সে অবহিত নহে সে ইহার অবস্থা কী বর্ণনা করিবে ? রোযা কেবল ইহাই নহে যে, মানুষ এই দিনে ক্ষুধা ও পিপাসার্ত থাকে। বরং ইহার একটি তাৎপর্য ও ইহার একটি প্রভাব আছে, যাহা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়। মানুষের প্রকৃতিতে ইহা আছে যে, সে যত কম খায় ততই তাহার আত্মা পবিত্র হয় এবং ‘কাশ্‌ফী’ শক্তি (দিব্য - দর্শনের শক্তি) বৃদ্ধি লাভ করে। ইহাতে খোদাতাআলার ইচ্ছা ইহাই যে, একটি খাদ্য কম কর এবং অন্যটিকে বাড়াও” (মলফুযাত, নবম খন্ড, পৃঃ ১২২, ১২৩)।

“সর্বদা রোযাদারের এই কথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ক্ষুধার্ত থাকাই তাহার উদ্দেশ্য নহে। বরং তাহার উচিত সে খোদাতাআলার যিক্‌র এ মগ্ন থাকিবে যাহাতে দুনিয়া ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌মুখী হওয়া যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য ইহাই যে, মানুষ একটি রুটি ছাড়িয়া দিয়া যাহা কেবল দেহ প্রতিপালন করে, দ্বিতীয় রুটি লাভ করে যাহা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ। যাহারা কেবল খোদার জন্য রোযা রাখে এবং নিছক রুসূম হিসাবে রাখে না, তাহাদের উচিত আল্লাহ্‌তাআলার ‘হামদ’ (প্রশংসা), ‘তসবীহ্‌’ (গুণ কীর্তন করা) ও তাহ্‌লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌) পাঠে মগ্ন থাকা, যদ্দরুন অন্য খাদ্যও তাহারা পাইয়া যাইবে” (মলফুযাত, নবম খন্ড পৃঃ ১২৩)।

যাহারা যাকাত দেওয়ার যোগ্য তাহারা যাকাত দিবে

(কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩১)

“অনুরূপভাবে রহিয়াছে যাকাত। বহু লোক যাকাত দিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা এতটুকুও চিন্তা করে না এবং বুঝে না যে, ইহা কাহার যাকাত। যদি কুকুর যবাই করিয়া দাও বা শূকরকে যবাই করিয়া দাও তবে কেবল যবাই করার দরুন উহারা হালাল হইয়া যাইবে না। যাকাত ‘তাযকিয়া’ (পবিত্রকরণ) হইতে বাহির হইয়াছে। ধন-সম্পদকে পবিত্র কর এবং উহা হইতে যাকাত দাও। যে ইহার মধ্য হইতে দেয় তাহার নিষ্ঠা কায়েম আছে। কিন্তু যে হালাল–হারামের মধ্যে পার্থক্য করে না সে ইহার আসল বিষয়-বস্তু হইতে দূরে পড়িয়া আছে। এই ধরনের ভুল হইতে মুক্ত হওয়া উচিত এবং এই মূল ভিত্তির তাৎপর্য উত্তমরূপে বুঝিয়া নেওয়া উচিত। তবেই এই মূল ভিত্তি ‘নাজাত’ (পরিত্রাণ) দেয়। নিশ্চিত জানিও অহংকার করার কোন বিষয় নাই। খোদাতাআলার কোন অভ্যন্তরীণ বা বাহিরের অংশীদার সাব্যস্ত করিও না এবং ‘আম্‌লে–সালেহা’ (সময়োপযোগী সৎ কাজ) কর” (মলফুযাত, নবম খন্ড, পৃঃ ১২৪, ১২৫)।

“যদি আমার জামাতে এইরূপ বন্ধু থাকে, যাহাদের উপর সম্পদ, অর্থ-কড়ি ও গহনা থাকার দরুন যাকাত ফরয, তাহাদের বুঝা উচিত যে, এই সময় ইসলাম ধর্মের ন্যায় গরীব ও এতীম এবং অসহায় আর কোন কিছুই নাই। তদুপরি যাকাত না দেওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের দিক হইতে যে কঠোর সতর্কবাণী রহিয়াছে তাহাও বলার অপেক্ষা রাখে না। যাহারা যাকাতের অস্বীকারকারী তাহারা অচিরেই কাফের হইয়া যাইবে।

অতএব ইসলামের সাহায্যে যাকাত দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। যাকাতের অর্থ দ্বারা বই-পুস্তকাদি খরিদ করা হউক এবং ইহা নিঃশর্ত বিতরণ করা হউক" (ইশ্‌তেহার সমগ্র, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩২৫)।

"বন্ধুগণ ! ইহা ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যাবলীর জন্য খেদমতের সময়। এই সময়কে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিও। ইহা কখনো আর ফিরিয়া আসিবে না। যাকাত দানকারীর উচিত সে যেন এখানেই তাহার যাকাত পাঠায়। প্রত্যেকেরই অপব্যয় হইতে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। এই পথে সে টাকা লাগাইবে, এবং অবশ্যই নিষ্ঠা দেখাইবে, যেন সে 'ফয্‌ল' ও রূহুল কুদুসের পুরস্কার লাভ করে। কেননা, এই পুরস্কার ঐ সকল লোকের জন্য প্রস্তুত যাহারা এই সিলসিলায় প্রবেশ করিয়াছে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃঃ ১৩৯ ও ১৪০)।

যাহার উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে এবং কোন বাধা-নিষেধ নাই সে হজ্জ করিবে

(কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ – ৩১)

"হজ্জে ভালবাসার সকল ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে গভীর ভালবাসায় কাপড়েরও প্রয়োজন থাকে না। ভালবাসাও এক প্রকার পাগলামী। কাপড় সাজগোজ করিয়া রাখার ব্যাপারটি ভালবাসায় থাকে না। শিয়ালকোটে একজন স্ত্রীলোক এক দর্জ্জীর প্রতি আসক্ত ছিল। তাহাকে ধরিয়া রাখা হইত। সে কাপড় ছিঁড়িয়া চলিয়া আসিত। মোট কথা, এই নমুনা, যাহা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভালবাসার পোষাকে হইয়া থাকে, তাহা হজ্জে মজুদ আছে। মাথা কামাইয়া ফেলা হয়। দৌড়াইতে হয়। ভালবাসার চুম্বন বাকী রহিল। তাহাও আছে, যাহা খোদার সমগ্র শরীয়তে রূপক ভাষায় চলিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া কুরবানীতেও চূড়ান্ত ভালবাসা দেখানো হইয়াছে। ইসলাম সম্পূর্ণরূপে এই সকল হক আদায়ের শিক্ষা দিয়াছে। নির্বোধ ঐ ব্যক্তি, যে তাহার অন্ধত্বের জন্য আপত্তি করে" (মলফুযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৯৯, ৩০০)।

"হজ্জের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই নহে যে, এক ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইল এবং সমুদ্র পাড়ি দিল ও গতানুগতিকভাবে কিছু শব্দ মুখে বলিয়া একটি রুসূম পালন করিয়া চলিয়া আসিল। আসল কথা এই যে, হজ্জ একটি উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপার, যাহা চূড়ান্ত পুণ্য কাজের শেষ গন্তব্য। বুঝা উচিত, মানুষের নিজের নফ্‌স্ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এই অধিকার আছে যে, সে আল্লাহ্‌তাআলার ভালবাসাতেই বিলীন হইয়া যাইবে এবং তাহার মধ্যে আল্লাহ্‌–প্রেম ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা এইভাবে সৃষ্টি হইয়া যাইবে যে, ইহার মোকাবেলায় না তাহার কোন সফরের কষ্ট হইবে, না প্রাণ ও ধন-সম্পদের পরোয়া থাকিবে এবং না প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন চিন্তা হইবে। প্রেমিক তাহার প্রেমাস্পদের জন্য যেভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়, সেভাবে সে-ও প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহার নমুনা হজ্জের মধ্যে আছে। প্রেমিক তাহার প্রেমাস্পদের চতুর্দিকে যেভাবে তওয়াফ করে সেভাবে হজ্জেও তওয়াফের ব্যবস্থা আছে। বয়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ঘর অর্থাৎ কা'বা শরীফ) একটি সূক্ষ্ম বিষয়। একটি ইহার চাইতেও উপরে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত উহার তওয়াফ না করিবে এই তওয়াফে লাভ নাই এবং পুণ্য নাই। উহার তওয়াফকারীদেরও এই অবস্থাই হওয়া

উচিত, যাহা এখানে দেখিতে পাও যে, শরীরে একটি সামান্য কাপড় রাখা হয়। এইভাবেই উহার তওয়াফকারীদের উচিত দুনিয়ার কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা এবং প্রেমিকের ন্যায় তওয়াফ করা। তওয়াফ খোদা প্রেমের চিহ্ন। ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার চুতর্দিকেই তওয়াফ করা উচিত। এরপর আর কোন উদ্দেশ্য বাকী থাকে না" (মলফুযাত, নবম খন্ড, পৃঃ ১২৩ ও ১২৪)।

কাযা ও কদর (অমোঘ নিয়তি)

"কাযা ও কদর (আল্লাহ্‌র অমোঘ নিয়তি) প্রকৃতপক্ষে এইরূপ একটি ব্যাপার যাহার আওতা হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার ক্ষমতা মানুষের নাই"(বারাহীনে আহমদীয়া, পঞ্চম অংশ পৃঃ ১)।

"মানুষ খোদার তকদীরের অধীনে আছে। যদি খোদার ইচ্ছা মানুষের ইচ্ছানুযায়ী না হয় তবে মানুষ হাজার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করিয়াও তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারে না। কিন্তু যখন খোদার ইচ্ছার সময় আসিয়া যায় তখন ঐ বিষয়ই যাহা খুব মুশ্‌কিল বলিয়া পরিদৃষ্ট হইতেছিল তাহা খুব সহজে ঘটিয়া যায়" (বারাহীনে আহমদীয়া, পঞ্চম অংশ পৃঃ ২)।

"তকদীর দুই ধরনের হইয়া থাকে। একটির নাম 'মুয়াল্লক' (নমনীয়) এবং অন্যটিকে 'মুবরাম' (অবধারিত) বলা হইয়া থাকে। যদি কোন তকদীর 'মুয়াল্লক' হয় তবে দোয়া ও সদকা উহাকে টলাইয়া দেয়। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহার দয়ায় এই তকদীরকে পরিবর্তন করিয়া দেন। মুবরাম তকদীরের ক্ষেত্রে সদকা ও দোয়া দ্বারা কোন ফায়দা হয় না। হাঁ, ঐগুলি (অর্থাৎ দোয়া সদকা) বৃথা ও অনর্থকও যায় না। কেননা, ইহা আল্লাহ্‌তাআলার মর্যাদা বিরোধী। তিনি ঐ দোয়া ও সদকার প্রভাব ও ফল অন্য কোনভাবে তাহাকে পৌছাইয়া থাকেন। কোন কোন অবস্থায় এইরূপও হয় যে, খোদাতাআলা কোন তকদীরে একটি সময় পর্যন্ত বিলম্ব করিয়া দেন। 'কাযায়ে মুয়াল্লক' ও 'মুবরাম' এর মূল-তত্ত্ব হাদীস ও কুরআন করীমে দেখিতে পাওয়া যায়" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ - ১০০ নূতন এডিশন)।

পরকালে বিশ্বাস

"অন্যান্য উপায় উপকরণের মধ্যে পরকালের উপর বিশ্বাসও সকল পুণ্য কাজ ও ন্যায়-পরায়ণতার বড় ভারী মাধ্যম। যখন কোন মানুষ পরকাল ও উহার বর্ণনাকে কিস্‌সা কাহিনী মনে করে তখন বুঝিয়া নাও যে, সে রদ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ইহ্‌কাল ও পরকাল উভয়ই হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। কারণ পরকালের ভয়ও মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞানের সঠিক উৎসের দিকে আকর্ষণ করিয়া নিয়া আসে। প্রকৃত খোদা-ভীতি ছাড়া খাঁটি তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা যায় না। অতএব স্মরণ রাখ, পরকাল সম্পর্কে কুপ্ররোচনা সৃষ্টি হইলে ঈমান বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়ে এবং 'খাত্‌মা বিল খায়ের' (শুভ পরিণতি) এ ত্রুটি দেখা দেয়" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩৪ নূতন এডিশন)।

" ইসলামে এই অত্যন্ত উঁচু মার্গের দর্শন আছে যে, প্রত্যেকে কবরেই এইরূপ দেহ লাভ করে যাহা স্বাদ ও শাস্তি অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমি সঠিক বলিতে পারি না ঐ দেহ কোন্ উপকরণ দ্বারা তৈয়ার করা হয়। কারণ এই নশ্বর দেহতো

শেষ হইয়া যায় এবং না কেহ ইহা প্রত্যক্ষ করে যে, এই দেহই প্রকৃতপক্ষে কবরে জীবিত হয়। ইহা এই জন্য যে, কোন কোন সময় এই দেহ জ্বালাইয়াও দেওয়া হয় এবং যাদুঘরের লাশ হিসাবেও রাখা হয় এবং এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কবরের বাহিরেও রাখা হয়। যদি এই দেহই জীবিত হইয়া যায় তবে নিশ্চয় লোক ইহা দেখিত। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কুরআন হইতে জীবিত হইয়া যাওয়া প্রমাণিত হয়। এই জন্য ইহা মানিতে হয় যে, অন্য কোন দেহের মাধ্যমে, যাহা আমরা দেখি না, মানুষকে জীবিত করা হয় এবং সম্ভবতঃ ঐ দেহ এই দেহের সূক্ষ্ম উপাদান দ্বারা তৈরী হয়। তখন দেহ লাভ করার পর মানবীয় শক্তি বহাল হয়। যেহেতু এই দ্বিতীয় দেহ পূর্বের দেহের তুলনায় নেহায়েত সূক্ষ্ম হয়, এই জন্য ইহার উপর কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন)-এর দরজা খুব বিস্তৃতভাবে খুলিয়া যায়" (রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৩, পৃঃ ৭০, ৭১ কিতাবুল বারীয়া)।

ফিরিশ্‌তাদের উপর ঈমানের রহস্য

"পৃথিবীর সকল অণু-পরমাণু, যদ্দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকে, এইগুলি সব খোদার ফিরিশ্‌তা। তওহীদ পূর্ণ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অণু-পরমাণুকে খোদার ফিরিশ্‌তা বলিয়া স্বীকার না করি। কেননা, যদি আমরা সকল প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানকে, যাহা পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, খোদার ফিরিশ্‌তা বলিয়া স্বীকার না করি তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের দেহে ও সমস্ত পৃথিবীতে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয় ঐগুলি খোদাতাআলার জ্ঞান, ইচ্ছা ও মর্জি ছাড়াই নিজে নিজেই হইতেছে। এমতাবস্থায় খোদাতাআলাকে কেবল পরিত্যক্ত বস্তু ও অজ্ঞ সত্তারূপে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ফিরিশ্‌তাদের উপর ঈমান আনার রহস্য এই যে, তাহারা ব্যতীত তওহীদ কায়েম থাকিতে পারে না এবং প্রত্যেক বস্তুকে ও প্রত্যেক প্রভাবকে খোদাতাআলার ইচ্ছার বাহিরে আছে বলিয়া মানিয়া নিতে হইবে। ফিরিশ্‌তার অর্থ তো ইহাই যে, ফিরিশ্‌তারা ঐ সত্তা যাহারা খোদার আদেশে কাজ করিতেছে। অতএব যেক্ষেত্রে এই নিয়ম জরুরী ও স্বীকৃত সেক্ষেত্রে জিব্রাইল ও মিকাঈলকে কেন অস্বীকার করা হইবে"(চশমায়ে মা'রেফাত, পৃঃ ১৭৩ হাশিয়া, মুদ্রণ ৩০শে মে, ১৯০৮)?

"সর্বশক্তিমান খোদা পৃথিবীর ঘটনাবলীকে এই বাহিরের উপকরণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, বরং একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাপারও যুগপৎ কার্যকর আছে। সূর্য বা চন্দ্র বা জমীন বা ঐ জলীয় বাষ্প যাহা হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, বা ঐ ধূলিঝড় যাহা প্রবল বেগে আসে, বা ঐ শিখা যাহা মাটিতে পড়ে, বা ঐ উল্কা যাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে, যদিও এই সকল বস্তু তাহাদের নিজ নিজ কাজে ও সকল পরিবর্তনে ও ঘটনাবলীতে বাহিরের উপকরণেরও সাহায্য নেয়, যাহাদের বর্ণনায় বিজ্ঞানীদের অফিস ভরিয়া আছে, কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও তত্ত্ব-জ্ঞানীরা জানেন যে, এই সকল উপকরণের পশ্চাতে আরো উপকরণ আছে, যাহা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণকারী। অন্য কথায় ইহার নাম মালায়েক (ফিরিশ্‌তা)। তাহারা যে বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত উহার সব কিছু শেষ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় এবং তাহাদের অধিকাংশ কাজে ঐ আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখে, যাহা মাওলা করীম তাহাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। তাহাদের কাজ নিরর্থক নহে; প্রত্যেক কাজে বড় বড় উদ্দেশ্য তাহাদের দৃষ্টিতে থাকে .....।

প্রজ্ঞাবান খোদা এই নিখিল বিশ্বকে সুন্দরভাবে চালানোর জন্য দুইটি ব্যবস্থাপনা রাখিয়াছেন। অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার সাথে ফিরিশ্‌তারা সম্পৃক্ত। বাহিরের ব্যবস্থাপনার কোন অংশ এইরূপ নাই, যাহার সহিত পর্দার অন্তরালে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা না থাকে ....। এই নিখিল বিশ্বের কার্যক্রম ও ঘটনাবলী নিজে নিজেই সংঘটিত হইতেছে না। এইগুলি মালিকের মর্জি ছাড়া এবং বৃথা ও খামাখাও সংঘটিত হইতেছে না। বরং আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র ও পৃথিবীর জড় বস্তুসমূহের জন্য পর্দার অন্তরালে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নিয়ন্ত্রণকারী নিযুক্ত আছেন, যাহাকে অন্য কথায় মালায়েক বলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন্‌ মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং সে নাস্তিক নহে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে এই কথা নিশ্চয় মানিতে হইবে যে, এই সকল কর্মকান্ড বৃথা নহে; বরং প্রত্যেকটি ঘটনা ও বিকাশের পিছনে খোদাতাআলার প্রজ্ঞা, উদ্দেশ্যমূলক যুক্তির হাত আছে এবং ঐ উদ্দেশ্য সকল ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী উপায়-উপকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেহেতু খোদাতাআলা গ্রহ-নক্ষত্র ও জড় বস্তুকে জ্ঞান ও অনুভূতি দেন নাই, এই জন্য ঐ সকল কাজ সম্পাদন করার জন্য জ্ঞান ও অনুভূতির প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপ উপকরণকে অর্থাৎ এইরূপ বস্তুর মাধ্যমের প্রয়োজন হয় যাহাকে জ্ঞান ও অনুভূতি দেওয়া হইয়াছে, এইগুলি মালায়েক" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, পৃঃ ১২৪-১২৮, হাশিয়া রূহানী খাযায়েন, জিলদ ৫)।

বেহেশ্‌ত ও দোযখ্‌

"বেহশ্‌ত কী ? ইহা হইল ঈমান ও সৎকর্মসমূহের মূর্তিমান দৃশ্য। উহাও দোযখের ন্যায় কোন বাহিরের জিনিষ নহে; বরং মানুষের বেহেশ্‌তও তাহার ভিতর হইতেই উদ্ভব হয়। স্মরণ রাখ, ঐ জায়গায় যে শান্তি ও আরাম পাওয়া যায় তাহা ঐ পবিত্র আত্মাই যাহা পৃথিবীতে তৈয়ার করা হইয়া থাকে। পবিত্র ঈমান চারাগাছের সদৃশ এবং উত্তম সৎকর্মসমূহ ও উত্তম চরিত্র এই চারাগাছে পানি সিঞ্চনের জন্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় যাহা ইহার শ্যামলীমা ও সজীবতাকে বহাল রাখে। এই পৃথিবীতে ইহাতো এইরূপ, যেরূপে স্বপ্নে দেখা যায়। কিন্তু ঐ জগতে ইহা অনুভব ও প্রত্যক্ষ করা যাইবে। এই কারণেই লেখা আছে যে, যখন বেহেশ্‌তীকে এই সকল পুরস্কারে ভূষিত করা হইবে তখন সে বলিবে, আল্লাযীনা রুযিক্বনা মিন ক্ববলু ওয়া উতূবিহী মুতাশবিহান (অর্থ ঃ ইহাতো সেই রিয্‌ক যাহা আমাদিগকে ইহার পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে উহার অনুরূপও দেওয়া হইবে – অনুবাদক)।

ইহার অর্থ এই নহে যে, পৃথিবীতে আমরা যে দুধ, মধু, বা আঙ্গুর – আনার ইত্যাদি জিনিষ খাওয়া-দাওয়া করি ঐগুলিই সেখানে পাওয়া যাইবে। না, ঐ সকল জিনিষ নিজেদের ধরন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ হইবে। কেবল নামের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও এই সকল পুরস্কারের নক্‌শা জড়রূপে দেখানো হইয়াছে, কিন্তু সাথে সাথেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ সকল বস্তু আত্মাকে উজ্জ্বল করে এবং ঐগুলি খোদার তত্ত্ব-জ্ঞান সৃষ্টিকারী। ইহাদের উৎস আত্মা ও ধর্মপরায়ণতা। রুযিক্‌না মিন ক্ববলু -এর যদি এই অর্থ করা যে, এইগুলি দুনিয়ার বস্তুগত পুরস্কার তবে

সম্পূর্ণরূপে ভুল করা হইবে। বরং এই আয়াতে আল্লাহ্তাআলার বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল মু'মিন (বিশ্বাসী) সময়োপযোগী সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা নিজেদের হাত দ্বারা এক বেহেশত্ বানাইয়াছে, যাহার ফল তাহারা এই পরকালের জীবনেও খাইবে। তাহারা যেহেতু এই ফল আধ্যাত্মিকভাবে পৃথিবীতেও খাইয়াছে এইজন্য ঐ জগতে ঐগুলিকে চিনিয়া ফেলিবে এবং বলিবে, এইগুলিতো ঐ ফলই মনে হয়। ইহা ঐ আধ্যাত্মিক উন্নতিই, যাহা পৃথিবীতে করা হইয়াছে। এই জন্য ঐ আবেদ-তত্ত্বজ্ঞানী ঐগুলিকে চিনিয়া ফেলিবে। আমি সুস্পষ্টভাবে বলিতে চাই, জাহান্নাম ও বেহেশতের মধ্যে একটি দর্শন আছে, যাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এইভাবে কায়েম হইয়া থাকে যাহা এখনই আমি বলিয়াছি। কিন্তু এই কথা কখনো ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, দুনিয়ার শাস্তি সতর্কীকরণ ও শিক্ষার জন্য ব্যবস্থাপনারূপে কাজ করে। তদবীর ও দয়া উভয়েই পরস্পরের মধ্যে একটি সম্পর্ক রাখে এবং এই সম্পর্কেরই বহির্প্রকাশ এই সকল শাস্তি ও পুরস্কার। মানুষের কর্মকান্ড ও আমল এইভাবেই রক্ষিত ও বন্ধ হইতে থাকে যেভাবে ফোনোগ্রাফে আওয়াজ বন্ধ করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তত্ত্ব-জ্ঞানী না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাপারে চিন্তা করিয়া কোন স্বাদ ও উপকার গ্রহণ করিতে পারে না" (মলফুযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃ ঃ ২৯, ৩০)।

"যেভাবে বেহেশ্তী জীবন এই পৃথিবীতেই শুরু হইয়া যায়, তদ্রূপেই দোযখের জীবনও মানুষ এখান হইতেই লইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, দোযখ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, নারুল্লাহিল মূক্বাদাতুল্লাতি তাত্তালিউল আফিদাহ্ অর্থাৎ দোযখ ঐ আগুন, যাহার উৎসমূল খোদার ক্রোধ, ইহা পাপ হইতে সৃষ্টি হয় এবং প্রথমে হৃদয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে। এই আগুনের শিকড় ঐ দুশ্চিন্তা ও আক্ষেপ, যাহা মানুষকে ঘিরিয়া ফেলে। কেননা, সকল আধ্যাত্মিক শাস্তি প্রথমে হৃদয় হইতেই শুরু হইয়া থাকে, সেভাবে সকল আধ্যাত্মিক সুখ ও আনন্দের উৎসও হৃদয় এবং ইহা হৃদয় হইতেই শুরু হওয়া উচিত। কেননা, হৃদয়ই ঈমান বা বেঈমানীর উৎসমূল। ঈমান বা বেঈমানীর অঙ্কুরও প্রথমে হৃদয় হইতেই বাহির হয়। অতঃপর সারা দেহে ও অঙ্গ-প্রতঙ্গে ইহার কাজ হয় এবং সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অতএব স্মরণ রাখ, বেহেশত্ ও দোযখ এই পৃথিবী হইতেই মানুষ সঙ্গে লইয়া যায়। এই কথা ভুলা উচিত নহে যে, বেহেশ্ত ও দোযখ এই জড় জগতের ন্যায় নহে, বরং এই দুইটিরও সূচনা ও উৎসমূল আধ্যাত্মিক বিষয়। হাঁ, ইহা সত্য কথা যে, পরকালে উহারা বস্তুর আকারে নিশ্চয় আকৃতি ধারণ করিয়া দৃষ্টিগোচর হইবে" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৫৭৩, ৫৭৪ নতুন এডিশন)।

"কুরআন শরীফের আলোকে দোযখ ও বেহেশ্ত উভয়ই প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি ও প্রভাব। ইহারা এমন কোন নূতন জড়বস্তু নহে, যাহা অন্য জায়গা হইতে আসিবে। ইহা সত্য যে, ঐ দুইটিই বস্তুর সাদৃশ্য হইবে। কিন্তু উহারা প্রকৃত আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি ও প্রভাব হইবে। আমরা এইরূপ বেহেশতে বিশ্বাসী নই যে, কেবলমাত্র জড়ভাবে জমীনে বৃক্ষ লাগানো হইয়াছে, এবং না এইরূপ দোযখে আমরা বিশ্বাসী যাহাতে প্রকৃতপক্ষে গন্ধকের পাথর আছে। বরং ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী বেহেশ্ত-দোযখ ঐ সকল কর্মকাণ্ডের প্রতিবিম্ব, যাহা মানুষ পৃথিবীতে করে" (রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১০, পৃঃ ৪১৩, ৪১৪)।

প্রত্যেক পুণ্যের শিকড় তাকওয়া (খোদা-ভীতি)

"অতএব হে লোক সকল ! যাহারা নিজদিগকে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য কর, তোমরা কেবল তখনই আকাশে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে যখন তাকওয়ার (খোদা-ভীতির) পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইবে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩০ নূতন এডিশন)।

"নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখ, কোন কর্ম খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, যাহা তাক্‌ওয়া-শূন্য। প্রত্যেক পুণ্যের শিকড় তাকওয়া। যে কাজে এই শিকড় বিনষ্ট হইবে না ঐ কাজও বিনষ্ট হইবে না" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩১)।

"তাকওয়া কী ? ইহা হইল সব ধরনের পাপ হইতে নিজেকে রক্ষা করা। অতএব খোদাতাআলা বলেন, পুণ্যবানদের জন্য প্রথম পুরস্কার কর্পূরের শরবত। এই শরবত পান করিলে মন্দ করার ক্ষেত্রে হৃদয় ঠান্ডা হইয়া যায়। ইহার পর তাহাদের হৃদয়ে মন্দ ও পাপ কাজের জন্য ইচ্ছার উদ্রেক হয় না এবং আবেগ সৃষ্টি হয় না। এক ব্যক্তির হৃদয়ে এই ধারণা তো আসে যে, এই কাজ ভাল নহে, এমনকি চোরের হৃদয়েও এই ধারণা আসিয়াই যায়। তবুও হৃদয়ের আবেগে সে চুরি করিয়াই থাকে। কিন্তু যে সকল লোককে কর্পূরের শরবত পান করানো হয় তাহাদের এই অবস্থা হইয়া যায় যে, তাহাদের হৃদয়ে মন্দ কাজের উদ্রেকই হয় না; বরং মন্দ কাজ হইতে হৃদয় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে এবং মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা হয়। পাপের সকল আবেগের উপাদানকে দাবাইয়া দেওয়া হয়। ইহা খোদার ফযল ছাড়া লাভ করা যায় না। যখন মানুষ দোয়া ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে খোদাতাআলার ফযল অন্বেষণ করে এবং নিজের নফ্‌সের আবেগকে সংযত করার জন্য চেষ্টা করে তখন এইগুলি খোদার ফযলকে আকর্ষণ করে এবং তাহাকে কর্পূরের শরবত পান করানো হয় .... । আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকীন "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তাআলা 'মুত্তাকীদেরই' (খোদা-ভীরুদেরই) ইবাদত কবুল করেন"। ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য কথা যে, নামায রোযাও মুত্তাকীদেরই কবুল হয় .... । অতএব প্রথম গন্তব্য ও মুশ্‌কিল এই মানুষের জন্য, যে মু'মিন হইতে চায়, ইহাই যে সে মন্দ কাজ হইতে বিরত হইবে। ইহারই নাম 'তাকওয়া' " (মলফুযাত, অষ্টম খন্ড, পৃঃ ৩৭৫-৩৭৭)।

মুত্তাকীর সংজ্ঞা ও ঈমানের দর্শন

"তাকওয়া এই কথার নাম, সে যখন দেখে সে পাপে পড়িয়া যায় তখন সে দোয়া ও 'তদবীর' (প্রচেষ্টা)-এর সহিত কাজ করিবে। নতুবা সে নির্বোধ হইবে। খোদাতাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে তাহার জন্য আল্লাহ মুশ্‌কিল ও কাঠিন্য হইতে মুক্তির পথ খুলিয়া দেন। 'মুত্তাকী' প্রকৃতপক্ষে সে, যে তাহার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী 'তদবীর' দ্বারা নির্ধারিত পথে কাজে করে" (মলফুযাত, ষষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২১৮)।

"কুরআন শরীফে সকল আদেশের মধ্যে 'তাকওয়া' ও 'পরহেযগারী' (মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকা)-এর জন্য বড় তাকিদ আছে। কারণ ইহাই যে, তাকওয়া সকল মন্দ কাজ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শক্তি দান করে এবং প্রত্যেক পুণ্যের দিকে দৌড়ানোর জন্য গতি দান করে। এতখানি তাকিদ করার পিছনে রহস্য ইহাই যে, তাকওয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষাকবজ এবং প্রত্যেক ধরনের

'ফেতনা' হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুদৃঢ় দুর্গ। একজন মুত্তাকী মানুষ এইরূপ অনেক অনর্থক ও বিপজ্জনক ঝগড়া-বিবাদ হইতে বাঁচিতে পারে, যাহার মধ্যে অন্য লোকেরা ফাঁসিয়া গিয়া কোন কোন সময় ধ্বংসের পর্যায়ে পৌছিয়া যায় এবং নিজেদের তাড়াহুড়া ও কুধারণার দ্বারা জাতির মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে এবং বিরুদ্ধবাদীদিগকে আপত্তি উঠাইবার সুযোগ দেয়" (আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ১১৬)।

"মানুষের সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য নিহিত আছে তাকওয়ার সকল সূক্ষ্ম পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে। তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম নক্শা ও মুখাবয়ব। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খোদাতাআলার আমানতসমূহ ও ঈমানের অঙ্গীকারসমূহের প্রতি ব্যাপকভাবে খেয়াল রাখা এবং মাথা হইতে পা পর্যন্ত যত শক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে যাহাদের মধ্যে বাহ্যিকভাবে চক্ষু, কান, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, এবং অভ্যন্তরীণভাবে হৃদয় এবং অন্যান্য শক্তি ও চারিত্রিক গুণাবলী আছে, এইগুলিকে যতটা শক্তিতে কুলায় সঠিকভাবে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা এবং অবৈধক্ষেত্রে প্রতিহত করা এবং এইগুলির গোপন আক্রমণ হইতে সতর্ক থাকা এবং এইগুলির মোকাবেলায় বান্দার হকের প্রতিও লক্ষ্য রাখা – এইগুলি ঐ পন্থা যাহার সহিত মানুষের সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সম্পর্কিত। খোদাতাআলা কুরআন শরীফে তাকওয়াকে পোষাক নামে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ "লিবাসুত্তাকওয়া" (অর্থ ঃ তাকওয়ার পোষাক – অনুবাদক) কুরআন শরীফের শব্দ। ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত যে, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক শোভা তাকওয়া হইতেই সৃষ্টি হয়। তাকওয়া ইহা যে, মানুষ খোদার সকল আমানত এবং ঈমানের অঙ্গীকার ও তদ্রূপেই সৃষ্টির সকল আমানত ও অঙ্গীকার এর প্রতি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য রাখিবে। অর্থাৎ উহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দিকসমূহের প্রতি সাধ্যমত খেয়াল রাখিবে" (বারাহীনে আহমদীয়ার পরিশিষ্ট, পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ৫১, ৫২)।

"খোদাতাআলা না বংশে এবং না জাতিতে রাজী হন। তাঁহার দৃষ্টি সর্বদা তাকওয়ার উপর থাকে। 'ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহে আতকাকুম" – অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট তোমাদর মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্য হইতে অধিক মুত্তাকী। ইহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কথা যে, আমি সৈয়্যদ বা মোঘল বা পাঠান এবং শেখ। উচ্চ জাতির সুবাদে গর্ব করা অনর্থক গর্ব। মৃত্যুর পর সব জাতি শেষ হইয়া যায়। খোদাতাআলার দরবারে জাতির কোন গুরুত্ব নাই এবং কোন ব্যক্তি উচ্চ বংশের লোক হওয়ার দরুন 'নাজাত' (মুক্তি) পাইতে পারে না। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেন, হে ফাতেমা (রাঃ)! তুমি এই কথার উপর গর্ব করিও না যে, তুমি পয়গম্বরের কন্যা। খোদা জাতির ধার ধারেন না। সেখানে যে মর্যাদা পাওয়া যায় তাহা তাকওয়ার ভিত্তিতে পাওয়া যায়। এই জাতি ও গোত্রের ব্যাপারটি পৃথিবীর পরিচিতি ও ব্যবস্থাপনার জন্য। খোদাতাআলার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। খোদাতাআলার ভালবাসা তাকওয়া হইতে সৃষ্টি হয়। তাকওয়াই উচ্চ মর্যাদার কারণ হইয়া থাকে। যদি কেহ সৈয়্যদ হয় এবং সে খৃষ্টান হইয়া রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গালি দেয় এবং খোদার আদেশের অবমাননা করে, তবে কি কেহ বলিতে পারে আল্লাহ্তাআলা তাহাকে রসূলের বংশ হওয়ার দরুন 'নাজাত' দিবেন এবং সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে ? "ইন্নাদ্দীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম" – আল্লাহ্তাআলার নিকট সত্য ধর্ম ইসলাম, যাহা 'নাজাতর' কারণ। যদি কেহ খৃষ্টান হইয়া যায় বা ইহুদী হয় বা আর্য হয়, সে খোদার নিকট সম্মান পাওয়ার যোগ্য নহে। খোদাতাআলা জাত ও জাতিকে উড়াইয়া দিয়াছেন। পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচিতির জন্য এই গোত্র। কিন্তু

আমি খুব চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, খোদাতাআলার দরবারে যে সম্মান পাওয়া যায় উহার আসল কারণ তাকওয়াই। যে মুত্তাকী সে জান্নাতে যাইবে। খোদাতাআলা তাহার জন্য ফয়সালা করিয়া ফেলিয়াছেন। খোদাতাআলার নিকট মুত্তাকীরাই সম্মানিত" (মলফুযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৩৪৩, ৩৪৪)।

"আমার বন্ধুদের উচিত তাহারা যেন আমার দোয়াসমূহকে বিনষ্ট হওয়া হইতে রক্ষা করে এবং উহাদের পথে যেন কোন বাধার সৃষ্টি না করে। ইহা তাহাদের অশালীন কাজ দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে। তাহাদর উচিত তাহারা যেন তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে। কেননা, তাকওয়াই এইরূপ একটি গুণ যাহাকে শরীয়তের সার-সংক্ষেপ বলা যাইতে পারে। যদি শরীয়তকে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হয়, তবে তাকওয়াই শরীয়তের মস্তিষ্ক হইতে পারে। তাকওয়ার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অনেক। কিন্তু যদি অন্বেষণকারী সত্যবাদী হইয়া অধ্যাবসায় ও নিষ্ঠার সহিত প্রাথমিক পর্যায় ও মার্গ অতিক্রম করে তবে সে নিষ্ঠা ও সত্যান্বেষণের দরুন উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৬৮ নতুন এডিশন)।

"আমার সম্প্রদায়ভুক্তরা এই চিন্তাকে সকল পার্থিব চিন্তার চাইতে অধিক নিজেদের প্রাণের সহিত একাত্ম করিয়া নিবে যে, তাহাদের মধ্যে তাকওয়া আছে কী নাই। মুত্তাকীদের জন্য এই শর্ত আছে যে, তাহারা নিজেদের জীবন দারিদ্র ও মিসকিনীর মধ্যে অতিবাহিত করিবে। ইহা তাকওয়ার একটি শাখা, যাহার মাধ্যমে আমাদিগকে অবৈধ ক্রোধের মোকাবেলা করিতে হইবে। ক্রোধ হইতে রক্ষা পাওয়াই হইল বড় বড় তত্ত্ব-জ্ঞানী ও সত্যবাদীর জন্য শেষ ও কঠিন গন্তব্য। গর্ব ও অহংকার ক্রোধ হইতে সৃষ্টি হয়। তদ্রূপেই কখনো কখনো স্বয়ং ক্রোধ গর্ব ও অহংকারের ফলশ্রুতি হইয়া থাকে। কেননা, ক্রোধ এই সময় হইবে যখন মানুষ তাহার নফ্‌সকে অন্যের উপর অগ্রাধিকার দেয়" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২২, ২৩)।

"আমার জামাতের জন্য বিশেষভাবে তাকওয়ার প্রয়োজন; বিশেষতঃ এই ধারণা হইতেও যে, তাহারা এইরূপ এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং তাহার বয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যাহার দাবী প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার। ইহাতে ঐ সমস্ত লোক যাহারা যে কোন ধরনের হিংসা, বিদ্বেষ বা শেরেকে নিমজ্জিত থাকুক না কেন বা যতই জড়াসক্ত হউক না কেন তাহারা এই সকল বিপদ হইতে 'নাজাত' পাইবে।

.... আল্লাহ্‌তাআলা দয়ালু ও করুণাময়। তদ্রূপেই তিনি শাস্তিদানকারী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারীও বটেন। তিনি একটি জামাতকে দেখেন যে তাহাদের দাবী ও বাগাড়ম্বর তো অনেক কিছু এবং তাহাদের 'আমল' (কর্ম)-এর অবস্থা এইরূপ নহে। এমতাবস্থায় তাহার রাগ ও ক্রোধ বাড়িয়া যায়। তখন তিনি এইরূপ জামাতের শাস্তির জন্য কাফেরদেরকেই বাছিয়া নেন" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৭, নূতন এডিশন)।

"আমরা কীভাবে খোদাতাআলাকে রাজী করিব এবং কীভাবে তিনি আমাদের সাথে থাকিবেন ? ইহার জবাব বারবার তিনি আমাকে ইহাই দিয়াছেন যে, তাকওয়ার সাহায্যে। অতএব হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা ! চেষ্টা কর যেন মুত্তাকী হইতে পার। 'আমল' ছাড়া সব কিছুই তুচ্ছ। নিষ্ঠা ছাড়া কোন 'আমল' গৃহীত হয় না। অতএব তাকওয়া ইহাই যে, এই সকল লোকসান হইতে বাঁচিয়া খোদাতাআলার দিকে অগ্রসর হও এবং 'পরহেযগারীর' (পাপ হইতে বিরত থাকার) সূক্ষ্ম পথের খেয়াল রাখ। সর্ব প্রথমে নিজেদের হৃদয়ে বিনয়, পরিচ্ছন্নতা ও নিষ্ঠা সৃষ্টি কর এবং সত্য সত্যই হৃদয়ের দিক হইতে সহিষ্ণু, সুবোধ ও গরীব হইয়া যাও। কেননা, প্রত্যেকটি ভাল ও মন্দ প্রথমে

হৃদয়েই জন্ম নেয়। যদি তোমার হৃদয় মন্দ চিন্তা হইতে মুক্ত হয়, তবে তোমার মুখও মন্দ কথা হইতে মুক্ত হইবে। তদ্রূপেই তোমার চক্ষু ও তোমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মন্দ হইতে মুক্ত হইবে। প্রত্যেক জ্যোতিঃ বা প্রত্যেক অন্ধকার প্রথমে হৃদয়েই জন্ম নেয় এবং ক্রমান্বয়ে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ছাইয়া ফেলে। অতএব নিজেদের হৃদয়ে সর্বদা সন্ধান করিতে থাক। যাহারা পান খায় তাহারা যেভাবে নিজেদের পানকে মুখের মধ্যে নাড়া-চাড়া করে এবং খারাপ টুকরাকে কাটিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়, তদ্রূপে তোমরাও তোমাদের হৃদয়ের গোপন চিন্তা-ভাবনা, গোপন অভ্যাস, গোপন আবেগ ও গোপন অনুভূতিকে নিজেদের দৃষ্টির সম্মুখে নাড়াচাড়া করিতে থাক এবং যখনই চিন্তা-ভাবনা বা অভ্যাস বা অনুভূতিকে মন্দ দেখিবে উহাকে কাটিয়া বাহিরে ফেল। এমন যেন না হয় যে, উহা তোমাদের সমস্ত হৃদয়কে অপবিত্র করিয়া দেয়, এবং তোমরা কাটা যাও" (রূহানী খাযায়েন, খন্ড ৩, পৃঃ ৫৪৭)।

দোয়া

"যে ব্যক্তি দোয়ায় রত থাকে না এবং বিনয়ের সাথে খোদাকে স্মরণ করে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ১৭, প্রথম এডিশন)।

"যে ব্যক্তি দোয়া করার সময় সুনির্দিষ্ট ওয়াদাসমূহ ছাড়া অন্য সব বিষয়ে খোদাকে শক্তিমান মনে করে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৭, ৩৮)।

"যখন তুমি দোয়ার জন্য দন্ডায়মান হও তখন তোমার এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, তোমার খোদা সব কিছুর উপর শক্তিশালী। তবে তোমার দোয়া গৃহীত হইবে এবং তুমি খোদার কুদরতের আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখিবে (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা ৪২)।

"ইহা আমার উপদেশ, যাহা আমি সমগ্র কুরআনে উপদেশাবলীর মস্তিষ্ক মনে করি। কুরআন শরীফে ৩০ পারা আছে এবং উহাদের সবগুলিই উপদেশে ভরপুর। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি জানে না যে, উহাদের মধ্যে ঐ উপদেশ কোন্‌টি, যাহার উপর মজবুত হইয়া গেলে ও উহার উপর পূর্ণ 'আমল' করিলে কুরআন করীমের সকল আদেশের উপর চলার ও সকল নিষেধ হইতে বাঁচার তওফীক লাভ করা যায়। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, ঐ চাবিকাঠি ও শক্তি হইল দোয়া। দোয়াকে মজবুতীর সাথে আঁকড়াইয়া ধর। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি ও নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে, ইহা করিলে আল্লাহ্‌তাআলা সকল মুশ্‌কিল সহজ করিয়া দিবেন" (মলফুযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ১৯৩, ১৯৪)।

"দোয়া খোদাতাআলার অস্তিত্বের শক্তিশালী প্রমাণ। বস্তুতঃ খোদাতাআলা এক জায়গায় বলেন, "যখন আমার বান্দারা তোমার নিকট প্রশ্ন করে যে, খোদা কোথায় এবং ইহার প্রমাণ কি ? তুমি বলিয়া দাও, তিনি খুবই নিকটে এবং ইহার প্রমাণ এই যে, যখন কোন দোয়াকারী আমাকে ডাকে তখন আমি তাহাকে উত্তর দিই।" এই উত্তর কখনো পুণ্যবানের স্বপ্নের মাধ্যম পাওয়া যায় এবং কখনো কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) ও ইলহামের মাধ্যমে এবং ইহা ছাড়া দোয়ার মাধ্যমে খোদাতাআলার কুদরত ও শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং জানা যায় তিনি এইরূপ শক্তিশালী যে, সকল মুশ্‌কিল সমাধা করিয়া দেন। মোট কথা, দোয়া বড় সম্পদ ও শক্তি। কুরআন শরীফে বহু জায়গায় ইহার সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে এবং এইরূপ লোকদের অবস্থাও বলা হইয়াছে, যাহারা দোয়ার মাধ্যমে নিজেদের মুশ্‌কিলসমূহ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। আম্বিয়া

আলায়হেস সালামের জীবনের শিকড় ও তাহাদের সফলতার আসল ও সত্য মাধ্যম এই দোয়াই। অতএব আমি উপদেশ দিতেছি যে, নিজেদের ঈমান ও আমলের শক্তি বাড়ানোর জন্য দোয়ায় রত থাক। দোয়ার মাধ্যমে এইরূপ পবির্তন হইবে, যাহা খোদার ফযলে 'খাতামা বিল খয়ের' (শুভ পরিণতি) হইয়া যাইবে" (মলফুযাত, সপ্তম খন্ড, পৃঃ ২৬৮, ২৬৯)।

'তদবীর' (প্রচেষ্টা) ও দোয়া

"উভয়কে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইল ইসলাম। এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, পাপ ও উদাসীনতা হইতে বাঁচার জন্য ততখানি 'তদবীর' কর যাহা তদবীরের হক এবং ততখানি দোয়া কর যাহা দোয়ার হক। এই কারণেই কুরআন শরীফের প্রথম সূরা ফাতেহায় এই দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলা হইয়াছে, ইয়্যাকানা' বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্‌তাঈন" (অর্থ ঃ আমরা তোমারই উপাসনা করি ও তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি – অনুবাদক)। ইয়্যাকানাবুদু তে এই আসল তদবীর এর কথা বলা হইয়াছে এবং ইহাকে অগ্রগণ্য করা হইয়াছে যে, প্রথমে মানুষ উপায় উপকরণের প্রতি খেয়াল রাখিবে এবং 'তদবীর' করিবে। কিন্তু ইহার সাথেই বলা হইয়াছে যে, দোয়া ছাড়া যাইবে না; বরং তদবীরের সাথেই ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মু'মিন যখন "ইয়াকানা'বুদু" বলে যে, আমরা তোমারই ইবাদত করি তখন সাথে সাথেই তাহার হৃদয়ে এই কথার উদ্রেক হয়, আমি কি জিনিস, যে আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদত করিব যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার ফযল ও দয়া না হয়। এইজন্য সে সাথে সাথেই বলে, ইয়্যাকানাসতাঈন সাহায্যও তোমার নিকট হইতেই চাই। ইহা একটি নাজুক বিষয়, যাহা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বুঝে নাই"(মলফুযাত,৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ২৬৮, ২৬৯)।

"বারবার আমার উপদেশ ইহাই যে, যতখানি সম্ভব বারবার নিজেদের নফ্‌সের বিশ্লেষণ কর। পাপ ছাড়িয়া দেওয়াও এক নিদর্শন। খোদাতাআলার নিকটেই চাও, তিনি যেন তোমাদিগকে তওফীক দান করেন। কেননা, তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা যাহা কর তাহাও সৃষ্টি করিয়াছেন। শক্তিও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত আমি আরো একটি ত্রুটি দেখিতেছি। কোন কোন লোক ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আমার নিকট এইরূপ চিঠি-পত্র আসিয়াছে, যাহাতে পত্র লেখকরা প্রকাশ করিয়াছে যে, আমরা চার বৎসর বা এত বৎসর ধরিয়া নামায পড়িয়া আসিতেছি ও দোয়া করিয়া আসিতেছি; কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। এইরূপ লোকদেরকে আমি নপংশুক মনে করি। ক্লান্ত হওয়া উচিত নহে।......... আমিতো এতদূর বলি, যদি ত্রিশ চল্লিশ বৎসরও অতিক্রান্ত হইয়া যায় তবুও ক্লান্ত হইবে না এবং বিরত হইবে না, যদি আবেগ বাড়িয়াও যায়। আল্লাহ্‌তাআলা দোয়াকারীদিগকে বিনষ্ট করেন না"(মলফুযাত, খন্ড ৯, পৃঃ ১২৯)।

"নামায কী ? ইহা একটি দোয়া। ইহাতে আছে পূর্ণ দরদ ও জ্বলন। এই জন্যই ইহার নাম 'সলাত'। কেননা, জ্বলন ও একনিষ্ঠতার সাথে চাওয়া হয় যেন আল্লাহ্‌তাআলা মন্দ ইচ্ছাসমূহ ও মন্দ আবেগসমূহকে ভিতর হইতে দূর করিয়া দেন এবং ইহার স্থলে পবিত্র ভালবাসা তাঁহার সাধারণ কল্যাণের অধীন করেন। --- খোদাতাআলা কোন দোয়া শুনেন না যতক্ষণ পর্যন্ত দোয়াকারী মৃত্যু পর্যন্ত না পৌঁছিয়া যায়।

.... দোয়ায় অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহ হইতেছে যে, হৃদয় গলিয়া যাইবে এবং আত্মা পানির ন্যায় আল্লাহ্‌তাআলার আস্তানায় পতিত হইবে এবং ইহাতে এক ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হইবে। এবং ইহার সাথে সাথেই মানুষ অধৈর্য হইবে না ও ত্বরা করিবে না বরং ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততার সাথে দোয়ায় রত থাকিবে। ইহার পরই ভরসা করা যায় যে, দোয়া গৃহীত হইবে” (মলফুযাত, খন্ড ৯, পৃঃ ১২৯)।

“ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, এই ধারণা যে আল্লাহ্‌র গৃহীত বান্দাদের সব দোয়াই কবুল হইয়া যায় – ইহা একেবারেই ভুল; বরং সত্য কথা এই যে, গৃহীত বান্দাদের সহিত খোদাতাআলার সম্পর্ক বন্ধুত্বের। কখনো তিনি তাহাদের দোয়া কবুল করিয়া নেন এবং কখনো তিনি নিজের ইচ্ছা তাহাদের দ্বারা মানাইয়া নিতে চান, যেমন তোমরা দেখিতে পাও যে, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এইরূপই হইয়া থাকে। কোন কোন সময় এক বন্ধু তাহার বন্ধুর কথা মানে এবং তাহার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে। কিন্তু অন্য সময় এমনও হয় যে, নিজের কথা তাহাকে দিয়া মানাইয়া নিতে চায়। ইহার প্রতিই আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন শরীফে ইঙ্গিত করিয়াছেন, যেমন কুরআন শরীফের এক জায়গায় মু’মিনদের দোয়া গ্রহণের ওয়াদা করেন এবং বলেন, “উদ্‌উনি আস্তাজিব লাকুম” অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তামাদের দোয়া কবুল করিব। অন্য জায়গায় তাঁহার নাযেলকৃত ‘কাযা ও কদর’ (অমোঘ নিয়তি)-এর উপর সন্তুষ্ট ও রাজী থাকার শিক্ষা দেন, যেমন বলেন, “এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধার (মাধ্যমে) এবং ধন-সম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফল-ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করিব; কিন্তু তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও, যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আসিলে বলে, ‘নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।”

অতএব এই উভয় আয়াতকে এক জায়গায় পড়িলে সুস্পষ্টভাবে জানা যাইবে যে, দোয়ার ব্যাপার ‘সুন্নতউল্লাহ্‌’ (আল্লাহ্‌র বিধান) কী এবং প্রভু ও দাসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী” (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন জিলদ-২২, পৃঃ ২১)।

ইসলামে এই নবুওয়তের দরজা বন্ধ যাহা স্বীয় প্রভাব খাটায়

(আইয়ামুস সুলাহ্‌, পৃঃ ৮২)

“খুব স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর শরীয়তী নবুওয়তের দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং কুরআন মজীদের পর আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই, যাহা নূতন বিধি-নিষেধ শিখাইবে, বা কুরআন শরীফের আদেশকে রহিত করিবে, বা ইহার অনুসরণ রদ করিবে; বরং ইহার ‘আমল’ কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে” (আল্‌ ওসীয়্যত, পৃঃ ১৪ হাশিয়া, মুদ্রণ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ইং)।

“কুরআন শরীফের আলোকে এইরূপ নবুওয়তের দরজা বন্ধ নহে, যাহা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কল্যাণে ও অনুসরণের মাধ্যমে কোন মানুষ খোদাতাআলার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার সম্ভাষণ-এর সম্মান লাভ করিবে এবং সে ওহী-ইলহামের মাধ্যমে গোপন বিষয় সম্পর্কে সংবাদ পাইবে। তাহা হইলে এই উম্মতের মধ্যে এইরূপ নবী কেন হইবেন না ? ইহার সম্পর্কে কী দলিল প্রমাণ আছে ? ইহা

আমার ধর্ম বিশ্বাস নহে যে, এইরূপ নবুওয়তের উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে। কেবল এই নবুওয়তের দরজা বন্ধ, যাহা শরীয়তের নূতন আদেশ-নিষেধ সঙ্গে আনিবে, বা এইরূপ দাবী করা হয়, যাহা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা হইতে পৃথক হইয়া দাবী করা হইবে। কিন্তু এইরূপ ব্যক্তি, যাহাকে একদিকে খোদাতাআলা তাঁহার ওহীতে উম্মতও সাব্যস্ত করেন এবং অন্যদিকে তাহার নাম নবীও রাখেন, এই দাবী কুরআন শরীফের নির্দেশ-বিরোধী নহে। কেননা, এই নবুওয়ত উম্মতী হওয়ার দরুন প্রকৃতপক্ষে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একটি প্রতিবিম্ব। ইহা কোন স্বাধীন নবুওয়ত নহে" (বারাহীনে আহমদীয়ার পরিশিষ্ট, পঞ্চম অংশ পৃঃ ১৮১, ১৮২)।

"স্মরণ রাখা উচিত, আমার উপর এবং আমার জামাতের উপর এই যে অপবাদ লাগানো হইয়া থাকে যে, আমরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খাতামান্নবীঈন মানি না ইহা আমাদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর মিথ্যা বানোয়াট। আমরা যে শক্তি, দৃঢ়-বিশ্বাস, তত্ত্ব-জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খাতামান্নবীঈন মানি ও বিশ্বাস করি, অন্যান্য লোকেরা ইহার লক্ষ ভাগের একভাগও মানে না। তাহাদের এইরূপ রুচিই নাই। তাহারা এই তাৎপর্য ও রহস্য, যাহা খাতামুল আম্বিয়ার খতমে নবুওয়ত এ আছে, তাহা বুঝেই না। তাহারা কেবল বাপ-দাদার নিকট হইতে একটি শব্দ শুনিয়াছে। কিন্তু ইহার মর্ম ও তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তাহারা জানে না, খতমে নবুওয়ত কাহাকে বলে এবং ইহার উপর ঈমান আনার অর্থ কী? কিন্তু আমি অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা (যাহা আল্লাহ্তাআলা উত্তম জানেন) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খাতামাল আম্বিয়া বিশ্বাস করি। খোদাতাআলা আমার নিকট খতমে নবুওয়তের মর্ম ও তাৎপর্য এইরূপে উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন যে, এই তত্ত্ব-জ্ঞানের শরবত যাহা আমাকে পান করানো হইয়াছে উহা হইতে এক বিশেষ স্বাদ উপভোগ করি। যে সকল লোক এই ঝরণায় প্লাবিত তাহারা ছাড়া অন্য কেহ ইহার ধারণা করিতে পারে না। জাগতিক দৃষ্টান্ত হইতে আমি খতমে নবুওয়তের দৃষ্টান্ত এইভাবে দিতে পারি, যেভাবে চন্দ্র 'হেলাল' হইতে শুরু হয় এবং চৌদ্দ তারিখে আসিয়া উহা পরিপূর্ণ হইয়া যায় যখন ইহাকে 'বদর' বলা হয়। এই ভাবেই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামে আসিয়া নবুওয়তের পরিপূর্ণতা শেষ হইয়া গিয়াছে। যে সকল লোকের ধর্ম-বিশ্বাস ইহা যে, নবুওয়ত বলপূর্বক শেষ হইয়া গিয়াছে এবং আঁ হযরত (সঃ)-কে ইউনুস বিন মাত্তার উপরও প্রাধান্য দেওয়া উচিত নহে, তাহারা এই মর্ম ও তাৎপর্যকে বুঝেই নাই এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিপূর্ণতা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই তাহাদের নাই। তাহাদের এই স্বল্প বুদ্ধিমত্তা ও স্বল্প জ্ঞান সত্ত্বেও আমাকে বলে, আমি খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী। আমি এইরূপ রুগ্নদিগকে কি বলিব এবং তাহাদের সম্পর্কে কী ভাষায় আক্ষেপ করিব" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২২৭, ২২৮ নূতন এডিশন)।

মসীহ্ নাসেরী আলায়হেস সালামের মৃত্যু

"আমি ঈমানের সহিত ও নিশ্চিত বিশ্বাসের সহিত এই কথা জানি যে, হযরত মসীহ আলায়হেস সালাম মৃত এবং মৃতগণের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁহার মরিয়া যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। কেন বিশ্বাস রাখিব না যখন কিনা আমার মাওলা ও আকা (প্রভু) তাঁহার কিতাব ও কুরআন করীমে তাঁহাকে মৃতদের দলভুক্ত করিয়াছেন। সমগ্র

কুরআনে একবারও তাঁহার অস্বাভাবিক জীবনের ও তাঁহার পুনরায় আগমনের উল্লেখ নাই; বরং তাঁহাকে কেবল মৃত বলার পর নীরব থাকা হইয়াছে। অতএব তাঁহার সশরীরে আকাশে জীবিত থাকা এবং পুনরায় কোন এক সময়ে পৃথিবীতে আসা না কেবল ইলহামের আলোকে ঘটনার পরিপন্থী মনে করি; বরং মসীহের বাঁচিয়া থাকার এই ধারণাকে কুরআন করীমের সুনিশ্চিত ও একীনী শিক্ষার আলোকে অনর্থক ও বাতিল বলিয়া জানি" (রূহানী খাযায়েন, খন্ড ৪, পৃঃ ৩১৫)।

"বর্তমান যুগের মুসলমানরা এক দিকে তো আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যু ও মাটিতে তাঁহার দাফন হওয়ার কথা স্বীকার করিয়া এবং অন্যদিকে মসীহ্ এখনো জীবিত আছেন স্বীকার করিয়া খৃষ্টানদের হাতে নিজেদের একটি লিখিত স্বীকৃতি দিয়া দিতেছে যে, মসীহ্ তাঁহার বৈশিষ্ট্যে সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্য হইতে বরং সকল নবীর বৈশিষ্ট্য হইতে ব্যতিক্রমধর্মী ও অতুলনীয়। কেননা, সেক্ষেত্রে এক শ্রেষ্ঠ মানুষ মসীহের ছয়শত বৎসর পরে আসিলেন, অল্প আয়ু পাইয়া মারা গেলেন এবং এই নবী করীমের মৃত্যুও তেরশত বৎসর অতিক্রম করিয়া গেল, কিন্তু মসীহ্ এখনো মারা গেলেন না, সেক্ষেত্রে কি এই কথা প্রমাণিত হয় নাকি অন্য কিছু যে, মসীহের অবস্থা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উর্ধ্বে। অতএব যদিও বর্তমান যুগের আলেমরা বাহ্যতঃ শিরক অস্বীকারের কথা প্রকাশ করে, কিন্তু মুশরেকদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে তাহারা চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। আফসোসের কথা এই যে, মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র কালামে হযরত মসীহের মৃত্যু প্রমাণ করেন, কিন্তু এই সকল লোক এখনো তাঁহাকে জীবিত মনে করিয়া ইসলামের জন্য হাজার হাজার এবং অসংখ্য ফেত্না দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। ইহারা মসীহকে আকাশে চিরঞ্জীবী ও সৈয়্যদুল আম্বিয়া সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মুর্দ্দা সাব্যস্ত করিয়াছ; অথচ কুরআন করীমে মসীহের সাক্ষাৎ এইভাবে লেখা আছে, "আমি একজন রসূলের সুসংবাদ দিতেছি, যিনি আমার পরে অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পরে আসিবেন এবং তাঁহার নাম হইবে আহমদ।" অতএব যদি মসীহ এখন পর্যন্ত এই জড় পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়া না থাকেন তবে ইহা দ্বারা অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও এখন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে আগমন করেন নাই" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, পৃঃ ৪১, ৪২)।

"এখন যে অবস্থায় কুরআন শরীফের সুস্পষ্ট কথা দ্বারা হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের মৃত্যুই প্রমাণিত হয় এবং অন্যদিকে কুরআন শরীফ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নাম খাতামান্নবীঈন রাখে এবং হাদীস এই উভয় কথার সত্যায়নকারী এবং সাথে সাথেই হাদীসে নববী এই কথাও বলিতেছে যে, আগমনকারী মসীহ এই উম্মতের মধ্য হইতেই হইবে (যে কোন জাতির মধ্য হইতেই হউক না কেন), তবে এ স্থলে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠে, সুস্পষ্ট শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও যাহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ও আগমনকারী মসীহের উম্মতী হওয়ার প্রমাণ দিতেছিল, সে স্থলে কেন এই বিষয়ে ঐক্যমত হইয়া গেল যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম শেষ যুগে আকাশ হইতে নামিয়া আসিবেন ? ইহার উত্তর এই যে, এই বিষয়ে যে ব্যক্তি ঐক্যমতের দাবী করে সে ভয়ানক নির্বোধ বা ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদী। কেননা, সাহাবাগণের এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহারা নিঃসন্দেহে–ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানী আয়াতের দরুন এই কথার উপর ঈমান আনিতেন যে, হযরত ঈসা

আলায়হেস সালাম মারা গিয়াছেন। তবেই তো হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহুতাআলা আনহু সম্মানিত রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় এই কথা উপলব্ধি করিয়া যে, কোন কোন লোক আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে সন্দেহ পোষণ করে, জোরের সহিত ইহা বর্ণনা করেন যে, কোন নবীই জীবিত নাই, সকলেই মারা গিয়াছেন। তিনি এই আয়াত পড়েন, – "তাহার পূর্বের সকল রসূল মারা গিয়াছেন" তাহার এই বর্ণনা কেহ অস্বীকার করেন নাই। এতদ্ব্যতীত ইমাম মালেকের ন্যায় ইমাম, যিনি ছিলেন হাদীস ও কুরআন বিশারদ এবং মুত্তাকী, তিনি এই কথায় বিশ্বাসী যে, হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম মারা গিয়াছেন। তদ্রূপেই ইমাম ইবনে হাযম, যাহার মর্যাদা বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে, তিনিও মসীহের মৃত্যুতে বিশ্বাসী। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী, যাহার কিতাব আল্লাহ্র কিতাবের পর সব চাইতে সঠিক, তিনিও মসীহ আলায়হেস সালামের মৃত্যুতে বিশ্বাসী। তদ্রূপে বিজ্ঞ মুহাদ্দিস (হাদীস বিশারদ) ও মুফাস্সির (কুরআনের ব্যাখ্যাকারী) ইব্নে তাইমিয়া এবং ইব্নে কাইয়্যুম, যাঁহারা নিজেদের সময়ের ইমাম, তাঁহারাও হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের মৃত্যুতে বিশ্বাসী। তদ্রূপেই সুফী প্রধান শেখ মুহীউদ্দিন ইব্নে আল্ আরাবী সরাসরি ও সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁহার তফসীরে হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের মৃত্যুর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অনুরূপভাবে বড় বড় বিজ্ঞজন, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ সরাসরি এই সাক্ষ্যই দিয়া আসিতেছেন এবং মুতাজিলা ফেরকার সকল বিখ্যাত ব্যক্তি ও ইমাম এই বিশ্বাসই রাখেন। তাহা হইলে ইহা কতখানি মিথ্যা বানোয়াট যে, হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের জীবিত আকাশে চলিয়া যাওয়া এবং পুনরায় ফিরিয়া আসাকে সকলের সম্মিলিত বিশ্বাস আখ্যা দেওয়া হয়। বরং ইহা এই যুগের জনসাধারণের ধারণা যখন কিনা হাজার হাজার বি'দাত ধর্মে সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। ইহা ছিল মধ্যযুগ, যাহার নাম আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বক্রযুগ রাখেন এবং বক্রযুগের লোকদের সম্পর্কে বলেন, "তাহারা আমার মধ্যে নহে এবং আমি তাহাদের মধ্যে নহি" .... এই সকল লোক এই বিশ্বাস গ্রহণ করিয়া চতুর্দিক হইতে কুরআন শরীফের বিরোধিতা করিয়াছে। এরপর যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এই কথার প্রমাণ কি যে, হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম সশরীরে আকাশে উঠিয়া গিয়াছিলেন, তবে তাহারা না কোন আয়াত পেশ করিতে পারে, না কোন হাদীস দেখাইতে পারে। কেবল "অবতরণ" শব্দটির সহিত নিজেদের তরফ হইতে "আকাশ" শব্দটি জুড়িয়া তাহারা জনগণকে ধোঁকা দিতেছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন 'মরফু' হাদীসে (উচ্চাংগের হাদীস) "আকাশ" শব্দটি পাওয়া যায় না এবং "অবতরণ" (নযূল) শব্দটি আরবী বাগধারায় মুসাফির এর জন্য ব্যবহার করা হয় এবং "অবতরণকারী" (নযীল) মুসাফিরকে বলা হয়। বস্তুতঃ আমাদের দেশেও এই বাকধারা আছে যে, সৌজন্যের খাতিরে শহরে আগমনকারী কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কোথায় অবতরণ ('উতরে') করিয়াছেন ? এই ধরনের কথা-বার্তায় কেহই এই ধারণা করে না যে, এই ব্যক্তি আকাশ হইতে অবতরণ করিয়াছে। যদি ইসলামের সমস্ত ফিরকার হাদীসের কিতাব তালাশ কর তবে 'সহীহ' হাদীস (খাঁটি হাদীস) তো দূরের কথা, মিথ্যা বানোয়াট হাদীসেও এইরূপ কথা দেখিতে পাইবে না যে, হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম সশরীরে আকাশে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং কোন এক যুগে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবেন। যদি কেহ

এইরূপ হাদীস পেশ করে তবে তাহাকে আমি বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে পারি। এতদ্ব্যতীত আমি তওবা করিব ও আমার সমস্ত বই-পুস্তক পোড়াইয়া ফেলিব। তাহারা যেভাবে আশ্বস্ত হয় আমি তাহাই করিব" (কেতাবুল বাড়ীয়া, পৃঃ ২১৯, ২২৬)।

"আমি হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের মর্যাদার অস্বীকারকারী নহি, যদিও খোদা আমাকে জানাইয়াছেন যে, মুহাম্মদী মসীহ মূসায়ী মসীহের চাইতে শ্রেয়ঃ। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আমি মসীহ ইব্‌নে মরিয়মকে খুব সম্মান করি। কেননা, আধ্যাত্মিক দিক হইতে যেভাবে আমি ইসলামে 'খাতামাল খুলাফা' সেভাবে মসীহ ইব্‌নে মরিয়ম ইসরাঈলী সেলসেলার জন্য 'খাতামাল খুলাফা' ছিলেন। মূসার সেলসেলায় ইবনে মরিয়ম প্রতিশ্রুত মসীহ ছিলেন এবং মুহাম্মদী সেলসেলায় আমি প্রতিশ্রুত মসীহ। অতএব আমি তাঁহাকে খুব সম্মান করি। তাঁহার নামে আমার নামকরণ করা হইয়াছে। ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও মিথ্যা বানোয়াটকারী ঐ ব্যক্তি, যে বলে আমি মসীহ ইবনে মরিয়মের সম্মান করি না। বরং মসীহতো মসীহ্, আমি তাঁহার চার ভ্রাতারও সম্মান করি। কেননা, তাঁহারা পাঁচজনই একই মায়ের পুত্র। কেবল ইহাই নহে; বরং আমি হযরত মসীহের দুই সহোদরা ভগ্নীকেও পবিত্র মনে করি। কেননা, এই সকল সম্মানিতগণ সতীস্বাধ্বী মরিয়মের গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৬, ৩৭ মুদ্রণ ১৯৫২)।

মসীহ্ মাওউদ ও মাহদী মা'হূদ

"যে ব্যক্তি আমাকে প্রকৃতপক্ষেই মসীহ মাওউদ ও মাহদী মা'হূদ (প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী) মনে করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৯ মুদ্রণ ১৯৫২)।

"যে ব্যক্তি সুপরিচিত বিষয়সমূহে আমার ন্যায়-সঙ্গত সমাধানে আমার অনুবর্তিতা করার জন্য প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৯ মুদ্রণ ১৯৫২)।

"মাহদী ও মসীহ মাওউদ সম্পর্কে আমার যে বিশ্বাস ও আমার জামাতের যে বিশ্বাস তাহা এই যে, এই ধরনের সমস্ত হাদীস যাহা মাহদীর আগমন সম্পর্কে বিদ্যমান, কখনো বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য নহে। আমার নিকট এইগুলি সম্পর্কে তিন ধরনের আপত্তি হইতে পারে, বা এইরূপ বল যে, আপত্তিগুলি তিন ধরনের বাহিরে নহে ঃ

(১) প্রথমতঃ এই সকল হাদীস দুর্বল, সঠিক নয় ও ভুল। ইহাদের বর্ণনাকারী বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাচারের অপরাধে অপরাধী। কোন ধার্মিক মুসলমান তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না।

(২) দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল হাদীস আছে, যেগুলি দুর্বল, বিতর্কিত, পরস্পর বিরোধী ও মতভেদের দরুন বিশ্বাসযোগ্য নহে। হাদীসের খ্যাতনামা ইমামগণ হয়তবা ইহাদের উল্লেখ একেবারেই করেন নাই, নয়ত বা আপত্তি ও স্বনির্ভরযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বর্ণনা করেন নাই, অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের সত্যবাদিতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন নাই।

(৩) তৃতীয়তঃ ঐ সকল হাদীস আছে, যেগুলি প্রকৃতপক্ষে সহীহ (সঠিক) তো বটে এবং বিভিন্ন বর্ণনা হইতে ইহাদের সত্যতা সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু হয়ত বা উহারা কোন পূর্বের যুগে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং বহুকাল পূর্বেই সকল যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং কোন অবস্থার অপেক্ষা করার কিছু অবশিষ্ট নাই, নয়তবা ব্যাপারটি এই যে,

উহাদের মধ্যে বাহ্যিক খেলাফত ও বাহ্যিক যুদ্ধের কোন উল্লেখই নাই। একজন মাহদী অর্থাৎ হেদায়াতপ্রাপ্ত মানুষের আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ইঙ্গিতে বরং সুস্পষ্ট ভাষায়ও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাঁহার বাহ্যিক বাদশাহী ও খেলাফত থাকিবে না এবং না তিনি যুদ্ধ করিবেন, না রক্তপাত করিবেন এবং না তাঁহার কোন সেনাবাহিনী থাকিবে। তিনি আধ্যাত্মিকতা ও মনঃসংযোগের শক্তিতে মানুষের হৃদয়ে ঈমান প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন, যেমন, লাল মাহ্দী ইল্লা ঈসা হাদীসে আছে। ইহা ইব্নে মাজার কেতাবে আছে। ইহা এই নামেই খ্যাত। ইহা হাকেমের কিতাব মুস্তাদরেক এ আনাস বিন মালেক হইতে বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা করিয়াছেন আবান বিন সালেহ হইতে মুহাম্মদ বিন খালেদ জুন্দী এবং হাসান বস্রী হইতে আবান বিন সালেহ এবং আনাস্ বিন মালেক হইতে হাসান বস্রী এবং জনাব রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে আনাস বিন মালেক। এই হাদীসের অর্থ এই যে, এই ব্যক্তি ব্যতীত, যিনি ঈসার স্বভাব ও প্রকৃতিতে আগমন করিবেন, আর কোন মাহ্দীই আগমন করিবেন না। অর্থাৎ তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ হইবেন এবং তিনিই মাহদী হইবেন, যিনি হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের স্বভাব ও প্রকৃতিতে ও শিক্ষার পন্থায় আগমন করিবেন। অর্থাৎ তিনি পাপের মোকাবেলা করিবেন না এবং যুদ্ধও করিবেন না। তিনি পবিত্র নমুনা ও আসমানী নিদর্শনের মাধ্যমে হেদায়াত বিস্তৃত করিবেন। এই হাদীসেরই সমর্থনে ঐ হাদীস আছে, যাহা ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ বুখারীতে লিখিয়াছেন। ইহার কথাগুলি এই যে, ইয়াযাউল হার্বা ঐ মাহ্দী, যাহার অন্য নাম মসীহ্ মাওউদ, তিনি ধর্ম যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে রহিত করিয়া দিবেন। তাঁহার হেদায়াত এই হইবে যে, ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিও না, বরং ধর্মকে সত্যতার জ্যোতির মাধ্যমে, নৈতিক অলৌকিক ঘটনা এবং খোদার নৈকট্যের নিদর্শনের দ্বারা বিস্তৃত কর" (রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৪, পৃঃ ৪২৯-৪৩২)।

বয়াতের তাৎপর্য

"জানিয়া রাখা উচিত যে, কেবল মাত্র মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা না হয়" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ২০)।

"বয়াতের অর্থ বিক্রয় করিয়া দেওয়া, যেভাবে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দেওয়ার পর ইহার সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। ইহা ক্রেতার অধিকার সে যাহা চাহিবে তাহাই করিবে। ..... এইভাবেই যাহার নিকট তুমি বয়াত করিতেছ, যদি তাহার আদেশের উপর ঠিক ঠিক না চল তবে কোন উপকার লাভ করিবে না"(মলফুযাত, খন্ড ৫, পৃঃ ২৮১)।

"বয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং ইহার অনুগমন করা উচিত। বয়াতের তাৎপর্য ইহাই যে, বয়াতগ্রহণকারী তাহার মধ্যে সত্যিকারের পরিবর্তন এবং নিজ হৃদয়ে খোদা-ভীতি সৃষ্টি করিবে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিয়া নিজের জীবনকে একটি পবিত্র নমুনা করিয়া দেখাইবে। যদি এইরূপ না হয় তবে বয়াতে কোন লাভ নেই; বরং এই বয়াত তাহার জন্য আরো আযাবের কারণ হইবে। কেননা, অঙ্গীকার করার পর জানিয়া বুঝিয়া ও সজ্ঞানে নাফরমানী করা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক" (মলফুযাত, দশম খন্ড, পৃঃ ৩৩৪)।

"বয়াত যদি অন্তর হইতে না করা হয় তবে ইহার কোন ফল নাই। আমার বয়াতে খোদা হৃদয়ের অঙ্গীকার চান। অতএব, যাহারা খাঁটি অন্তঃকরণে আমাকে গ্রহণ করে

এবং নিজেদের পাপ হইতে খাঁটি তওবা করে ক্ষমাশীল ও দয়ালু খোদা তাহাদের পাপসমূহ নিশ্চয় ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহারা এইরূপ হইয়া যায় যেন মায়ের গর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে। তদবস্থায় ফিরিশ্‌তারা তাহাদিগকে রক্ষা করে" (মলফুযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৬২)।

"তোমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব এই অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সকল প্রকার পাপ হইতে বাঁচিতে থাক। এতদ্ব্যতীত এই অঙ্গীকারে মজবুত থাকার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দোয়া করিতে থাক। তিনি নিশ্চিতরূপে তোমাদিগকে আশ্বস্তি ও শান্তি দিবেন এবং তোমাদের পদদ্বয়কে দৃঢ় রাখিবেন। কেননা, যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তঃকরণে খোদাতাআলার নিকট চায় তাহাকে দেওয়া হয়। আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে, যাহাদিগকে আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ও অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু আমি কি করিব। এই পরীক্ষা নূতন নহে। যখন খোদাতাআলা কাউকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এবং কেহ তাঁহার দিকে চলে তখন পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাওয়া তাহার জন্য জরুরী হয়। পৃথিবী ও ইহার সহিত সম্পর্ক অস্থায়ী ও নশ্বর। কিন্তু খোদাতাআলার সহিত আমাদের সম্পর্ক সর্বকালের। কাজেই তাঁহার দিক হইতে মানুষ কেন মুখ ফিরাইবে" (মলফুযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ২৩৬)।

পরীক্ষা

"যেভাবে পূর্বের মু'মিনদের পরীক্ষা হইয়াছে, তদ্রূপেই ইহা নিশ্চিত যে, বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ-বিপদের দ্বারা তোমাদেরও পরীক্ষা হইবে। অতএব সাবধান হও যেন এইরূপ না হয় যে, তোমরা হোঁচট খাও। যদি আকাশের সহিত তোমাদের সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকে তবে যমীন তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। যদি তোমরা কখনো নিজেদের ক্ষতি সাধন কর তবে তাহা নিজেদের হাতেই করিবে, না দুশমনের হাতে। যদি তোমাদের সকল জাগতিক সম্মান চলিয়া যাইতে থাকে, তবে খোদা তোমাদিগকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দান করিবেন। অতএব তোমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। ইহা নিশ্চিত যে, তোমাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইবে এবং তোমাদের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অতএব এমতাবস্থায় তোমরা মনঃক্ষুণ্ন হইও না। কেননা, তোমাদের খোদা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, তোমরা তাঁহার পথে দৃঢ়পদ আছ কি না। যদি তোমরা চাও আকাশের ফিরিশ্‌তারাও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা মার খাইয়া খুশী থাক এবং গালি শুনিয়া শোকর কর। ব্যর্থতা দেখিয়া আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিও না। তোমরা খোদার শেষ জামাত। অতএব ঐ পুণ্য কর্ম করিয়া দেখাও, যাহা স্বীয় উৎকর্ষতায় চূড়ান্ত পর্যায়ের হইবে। তোমাদের মধ্যে যে কেহ অলস হইয়া যাইবে তাহাকে এক অপবিত্র বস্তুর ন্যায় জামাত হইতে বাহিরে ছুড়িয়া ফেলা হইবে এবং সে আক্ষেপের সহিত মরিবে। সে খোদার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩১, ৩২)।

"হে আমার বন্ধুরা ! যাহারা আমার বয়াতের সেলসেলায় প্রবেশ করিয়াছ, খোদা আমাকে ও তোমাদিগকে ঐ সকল বিষয়ের তওফীক দান করুন যদ্দারা তিনি রাজী হইয়া যাইবেন। আজ তোমরা সংখ্যায় অল্প এবং তোমাদিগকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং

তোমাদের উপর এক পরীক্ষার সময় চলিতেছে। ইহাই 'সুন্নতউল্লাহ্' (আল্লাহ্র বিধান), যাহা আদি হইতে জারী আছে। চতুর্দিক হইতে চেষ্টা করা হইবে যাহাতে তোমরা হোঁচট খাও। তোমাদিগকে সর্বপ্রকারে কষ্ট দেওয়া হইবে এবং বিভিন্ন প্রকারের কথা তোমাদিগকে শুনিতে হইবে। যাহারা তোমাদিগকে মুখ দ্বারা বা হাত দ্বারা দুঃখ দিবে তাহারা ধারণা করিবে যে, ইসলামের সাহায্য করিতেছে। কিছু আসমানী পরীক্ষাও তোমাদের উপর আসিবে, যাহাতে তোমরা সর্বপ্রকারে পরীক্ষীত হও। অতএব তোমরা এখন শুনিয়া রাখ, তোমাদের বিজয়ী হইয়া যাওয়ার রাস্তা এই নহে যে, তোমরা শুষ্ক যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে কাজ সম্পাদন করিবে, অথবা হাসি-ঠাট্টার মোকাবেলায় হাসি-ঠাট্টা করিবে, অথবা গালির মোকাবেলায় গালি দিবে। কেননা, যদি তোমরা এই পথই অবলম্বন কর তবে তোমাদের হৃদয় কঠোর হইয়া যাইবে এবং তোমাদের মধ্যে কেবল কথা আর কথাই থাকিয়া যাইবে। ইহাকে খোদাতাআলা ধিক্কার করেন ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। অতএব তোমরা এইরূপ করিও না, যাহাতে নিজেদের জন্য দুইটি অভিসম্পাত ডাকিয়া আন– একটি মানুষের এবং অন্যটি খোদারও" (রূহানী খাযায়েন, খন্ড ৩, পৃঃ ৫৪৬, ৫৪৭)।

"কখনো মনে করিবে না যে, খোদা তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যাহা জমীনে বপন করা হইয়াছে। খোদা বলেন, এই বীজ বর্দ্ধিত হইবে, পুষ্প প্রদান করিবে, প্রত্যেক দিকে ইহার শাখা-প্রশাখা নির্গত হইবে এবং এক মহামহীরূহে পরিণত হইবে। সুতরাং কল্যাণমন্ডিত তাহারা যাহারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তীকালীন বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না, কারণ বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক যদ্দারা খোদাতাআলা তোমাদের পরীক্ষা করেন– কে তোমাদের মধ্যে স্বীয় বয়াতের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী, যে ব্যক্তি কোন বিপদের সময় পদস্খলিত হইবে সে খোদার কিছুই অনিষ্ট করিবে না, তাহার দুর্ভাগ্য তাহাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। তাহার জন্ম না হইলেই তাহার পক্ষে ভাল ছিল। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিবে, তাহাদের উপর বিপদাবলীর ভূমিকম্প আসিবে, দুর্ঘটনার তুফান বহিবে, জাতিগণ তাহাদের প্রতি হাসি-বিদ্রূপ করিবে এবং জগৎ তাহাদের প্রতি ঘৃণাসূচক ব্যবহার করিবে, কিন্তু পরিশেষে তাহারা বিজয় লাভ করিবে, এবং আশিসের দ্বারসমূহ তাহাদের জন্য উদঘাটিত হইবে" (আল্ ওসীয়্যত, পৃঃ ১১ ও ১২)।

আহ্মদীয়তের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

"আমি প্রতি মুহূর্তে এই চিন্তায় থাকি কীভাবে আমাদের ও খৃষ্টানদের ফয়সালা হইবে। মৃত পূজার ফেতনায় আমার হৃদয়ে রক্ত ঝরে এবং আমার প্রাণ অদ্ভুতরূপে ছটফট করে। ইহার চাইতে অধিক আর কি মনোবেদনা হইবে যে, এক দুর্বল মানুষকে খোদা বানানো হইয়াছে এবং এক মুষ্টি মাটিকে 'রব্বুল আলামীন (নিখিল বিশ্ব জগৎ-এর প্রভু) মনে করা হইয়াছে। আমি কবেই এই চিন্তায় শেষ হইয়া যাইতাম যদি আমার 'মাওলা' (প্রভু) ও আমার সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে আশ্বস্ত না করিতেন যে, পরিণামে 'তওহীদ' (আল্লাহ্তাআলার একত্ববাদ) জয়যুক্ত হইবে। 'গয়ের মা'বূদ' (আল্লাহ ছাড়া উপাস্য অন্য সব কিছু) বিনাশ প্রাপ্ত হইবে এবং মিথ্যা খোদাকে তাহার খোদায়ীর অস্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে। মরিয়মের উপাস্যসুলভ জীবনের উপর মৃত্যু

আসিবে। এতদ্ব্যতীত তাহার পুত্র এখন নিশ্চয় মরিবে। ------- এখন ঐ দিন নিকটে আসিতেছে যখন সত্যের সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদিত হইবে এবং ইউরোপবাসীরা সত্য খোদার সন্ধান লাভ করিবে। ইহার পর তওবার দরজা বন্ধ হইবে। কেননা, প্রবেশকারীরা বড় জোরের সহিত প্রবেশ করিবে। তাহারাই বাকী থাকিয়া যাইবে, যাহাদের হৃদয়ের দরজা প্রকৃতিগতভাবে বন্ধ। অচিরে ইসলাম ব্যতীত সব ধর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সকল অস্ত্র ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু ইসলামের আসমানী অস্ত্র না ভাঙ্গিবে এবং না ভোঁতা হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা দাজ্জালীয়তকে টুকরা টুকরা করিয়া না দিবে" (মজমুয়া ইশ্‌তেহারাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৩০৪, ৩০৫)।

"হে লোক সকল ! শুনিয়া রাখ, ইহা তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই জামাতকে সকল দেশে বিস্তৃত করিয়া দিবেন এবং 'হুজ্জত' ও যুক্তির আলোকে সকলের উপর তাহাদিগকে বিজয় দান করিবেন। ঐ দিন আসিতেছে, বরং তাহা নিকটবর্তী যখন পৃথিবীতে কেবল এই একটিই ধর্ম হইবে যাহাকে সম্মানের সহিত স্মরণ করা হইবে। খোদা এই ধর্মে ও এই সেলসেলায় উচ্চ পর্যায়ের ও অসাধারণ বরকত দিবেন। যাহারা ইহাকে নিশ্চিহ্ন করার চিন্তা করে তাহাদের সকলকে ব্যর্থ করিবেন এবং এই বিজয় সর্বদা থাকিবে, এমনকি কেয়ামত আসিয়া যাইবে। --------- পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হইবে এবং একজনই নেতা হইবেন। আমিতো একটি বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। অতএব আমার হাতে ঐ বীজ বপন করা হইয়াছে। এখন উহা বাড়িবে ও ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হইবে। এমন কেহ নাই, যে ইহাকে প্রতিহত করিতে পারে" (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, পৃঃ ৬৬, ৬৭)।

ধর্মকে দুনিয়ার উপর অগ্রগণ্য কর

"যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে দুনিয়ার উপর অগ্রগণ্য করে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশ্‌তিয়ে নুহ, পৃঃ ৩৮ নূতন এডিশন)।

"যে ব্যক্তি পৃথিবীর লালসায় ফাঁসিয়া আছে এবং পরকালের প্রতি চক্ষু উঠাইয়াও দেখে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৮)।

"বন্ধুগণ ! ইহা ধর্মের জন্য এবং ধর্মের প্রয়োজনে খেদমতের সময়। এই সময়কে 'গনীমত' মনে কর। ইহা পুনরায় কখনো হাতে আসিবে না। -------- তোমরা এইরূপ সম্মানিত নবী (সঃ)-এর অনুসারী হইয়া কেন সাহস হারাইতেছ ও তোমরা নিজেদের ঐ নমুনা দেখাও যেন ফিরিশ্‌তারাও আকাশে তোমাদের সত্যবাদিতা ও পবিত্রতায় অবাক হইয়া যায় এবং তোমাদের উপর দরূদ প্রেরণ করে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ১৩৯ ও ১৪১)।

"এখন তোমরা যখন বয়াত গ্রহণ করিয়াছ তখন তোমাদের বুঝিয়া নেওয়া উচিত তোমরা অঙ্গীকার করিয়াছ যে, আমরা ধর্মকে জগতের উপর অগ্রগণ্য করিব। অনন্তর স্মরণ রাখা উচিত তোমাদের এই অঙ্গীকার আল্লাহ্‌র সাথে। যতটুকু সম্ভব এই অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকা উচিত। নামায ও রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং শরীয়তের ব্যাপারে 'পাবন্দ' (নিয়মিত পালনকারী) থাকা উচিত। প্রত্যেক মন্দ ও পাপের চিহ্ন হইতেও বাঁচিয়া থাকা উচিত। আমার জামাতকে একটি পবিত্র নমুনায় পরিণত হইয়া দেখানো উচিত। মৌখিক বাগাড়ম্বরে কোন কাজ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কিছু করিয়া না দেখায়" (মলফুযাত, খন্ড ৫, পৃঃ ৪৫৩)।

পাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার পন্থা কেবলমাত্র 'কামেল একীন' (পরিপূর্ণ বিশ্বাস)

"হে খোদার অন্বেষণকারী বান্দারা ! কান খুলিয়া শুন, 'একীন' (বিশ্বাস)-এর ন্যায় কোন কিছু নাই। একীনই পাপ তাড়াইয়া দেয়। একীনই পুণ্য করার শক্তি যোগায়। একীনই খোদার সত্যিকারের প্রেমিক বানাইয়া দেয়। তোমরা কি একীন ব্যতীত পাপ ছাড়িতে পার ? তোমরা কি একীনের জ্যোর্তিবিকাশ ছাড়া প্রবৃত্তির আবেগকে প্রতিহত করিতে পার ? তোমরা কি একীন ব্যতীত কোন আশ্বস্তি লাভ করিতে পার ? তোমরা কি একীন ব্যতীত কোন সত্যিকারের পরিবর্তন আনিতে পার ? তোমরা কি একীন ব্যতীত কোন সত্যিকারের খুশীর অবস্থা লাভ করিতে পার ? আকাশের নীচে কি এইরূপ কোন প্রায়শ্চিত্ত ও এইরূপ 'ফিদিয়া' (বিনিময়) আছে, যাহা তোমাদিগকে পাপ ছাড়াইতে পারে ? -------

অতএব তোমরা স্মরণ রাখ, একীন ব্যতীত তোমরা অন্ধকারের জীবন হইতে বাহিরে আসিতে পার না এবং না তোমরা রূহুল কুদুস' (পবিত্র আত্মা) লাভ করিতে পার। মুবারক তাহারা যাহারা একীন রাখে। কেননা, তাহারাই খোদাকে দেখিবে। মুবারক তাহারা যাহারা সন্দেহ ও সংশয় হইতে মুক্তি পাইয়া গিয়াছে। কেননা, তাহারাই পাপ হইতে মুক্তি পাইবে। তোমরা মুবারক হইবে যখন তোমাদিগকে একীনের সম্পদ দেওয়া হইবে যে, ইহার পর তোমাদের পাপের পরিসমাপ্তি হইবে। পাপ এবং একীন উভয়ে একত্রে থাকিতে পারে না। তোমরা কি এইরূপ ছিদ্রে হাত ঢুকাইতে পার যাহার মধ্যে তোমরা একটি ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ দেখিতেছ ? তোমরা কি এইরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে যেস্থানে কোন আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নুৎপাত হইতেছে, বা সেস্থানে বজ্রপাত হইতেছে, বা যাহা একটি রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের আক্রমণ করার স্থান, বা যাহা এইরূপ একটি স্থান যেখানে প্লেগের মহামারী মানব গোষ্ঠিকে নিশ্চিহ্ন করিতেছে ? অতঃপর যদি খোদার উপর তোমাদের এইরূপই একীন থাকে যেভাবে আছে সাপের উপর বা বজ্রের উপর বা প্লেগের উপর, তবে সম্ভব নহে যে, ইহার মোকাবেলায় তোমরা 'নাফরমানী' করিয়া শাস্তির রাস্তা গ্রহণ করিতে পার বা তাঁহার সহিত সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পার।

হে ঐ সমস্ত লোক ! তোমাদিগকে পুণ্য ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। নিশ্চিত জানিও, তোমাদের মধ্যে খোদার আকর্ষণ ঐ সময় সৃষ্টি হইবে এবং ঐ সময় তোমাদিগকে পাপের ঘৃণ্য দাগ হইতে পবিত্র করা হইবে যখন তোমাদের হৃদয় একীনে ভরিয়া যাইবে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ১১২–১১৪)।

এই সকল কথার পর আবার আমি বলিতেছি, এই ধারণা করিও না যে, আমরা বাহ্যিকভাবে বয়াত করিয়া নিয়াছি। বাহ্যিকতা কোন বস্তুই নহে। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখেন এবং তদনুযায়ী তোমাদের সাথে আচরণ করিবেন। দেখ আমি এই কথা বলিয়া তবলীগের দায়িত্ব পালন করিতেছি যে, পাপ এক প্রকার বিষ বিশেষ। উহা পান করিও না। খোদার নাফরমানী এক অপবিত্র মৃত্যু। ইহা হইতে বাঁচ। দোয়া কর যেন তোমরা শক্তি লাভ করিতে পার" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৭, নুতন এডিশন)।

ইস্তেগফার

“ইস্তেগফার কী ? ইহা এই যে, যে পাপ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে উহার কুফল হইতে যেন খোদাতাআলা রক্ষা করেন এবং যে পাপ এখনো করা হয় নাই এবং যাহা মানুষের প্রকৃতি ও শক্তিতে মজুদ আছে উহা করার সময়ই যেন না আসে এবং উহা যেন অভ্যন্তরেই জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়”(মলফুযাত, পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ২৯৯)।

“অভিধানে ‘মাগফেরাত’ এইরূপ ঢাকনাকে বলা হয় যদ্বারা মানুষ বিপদ হইতে রক্ষিত হয়। এই কারণেই ‘মাগফের’ এর অর্থ বর্ম। ইহা হইতেই শব্দটি বাহির হইয়াছে। ‘মাগফেরাত’ চাওয়ার অর্থ এই যে, যে বিপদের ভয় আছে বা যে পাপের আশঙ্কা আছে খোদাতাআলা যেন এই বিপদের বা এই পাপের প্রকাশকে প্রতিহত করেন এবং ঢাকিয়া রাখেন” (নূরুল কুরআন, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬, ২৭)

“ইস্তেগফার, যাহার দ্বারা ঈমানের শিকড় মজবুত হয়, তাহা কুরআন শরীফে দুই অর্থে আসিয়াছে। একটি ইহা যে, নিজের হৃদয়কে খোদার ভালবাসায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া পাপের প্রকাশকে, যাহা পৃথক হওয়ার অবস্থায় ভড়কাইয়া উঠে, খোদাতাআলার সম্পর্কের সহিত প্রতিহত করা এবং খোদাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া। এই ‘ইস্তেগফার’ নৈকট্য প্রাপ্তদের, যাহারা এক মুহূর্তের জন্য খোদা হইতে পৃথক হওয়াকে নিজেদের ধ্বংসের কারণ বলিয়া জানে। এই জন্য তাঁহারা ‘ইস্তেগফার’ করেন যাহাতে খোদা তাঁহার ভালবাসায় তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া রাখেন। দ্বিতীয় প্রকারের ‘ইস্তেগফার’ এই যে, পাপ হইতে বাহির হইয়া খোদার দিকে দৌড়াইয়া যাওয়া এবং চেষ্টা করা যেভাবে বৃক্ষ মাটিতে লাগিয়া যায়। তদ্রূপেই হৃদয় খোদার ভালবাসায় বন্দী হইয়া যাইবে যাহাতে পবিত্র লালন-পালনের মাধ্যমে ইহা পাপের শুষ্কতা ও ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া যাইবে। এই উভয় অবস্থার নাম ‘ইস্তেগফার’ রাখা হইয়াছে। কেননা, ‘গাফর’ যাহা হইতে ‘ইস্তেগফার’ বাহির হইয়াছে, ঢাকিয়া দেওয়া ও পুঁতিয়া দেওয়াকে বলা হয়, যেন ‘ইস্তেগফার’ এর অর্থ যে, খোদা ঐ ব্যক্তির পাপকে পুঁতিয়া রাখেন যাহা সে ইহার ভালবাসায় নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে এবং মানবীয় শিকড়কে নগ্ন হইতে না দেন বরং খোদায়ী চাদরে আবৃত করিয়া তাঁহার পবিত্রতা হইতে অংশ দেন, বা পাপের প্রকাশের দরুন যদি কোন শিকড় নগ্ন হইয়া গিয়া থাকে উহাকে পুনরায় যেন ঢাকিয়া দেন এবং ইহার নগ্নতার কুফল হইতে রক্ষা করেন”(সিরাজউদ্দীন ঈসায়ী কে চার সাওয়াসলোঁ কা জওয়াব, পৃঃ ২০, ২১)।

পুণ্যবানগণের সাহচর্য

“কুরআন শরীফে আসিয়াছে ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা (আশ্ শাম্স ঃ ১০)। সে মুক্তি পাইয়াছে, যে নিজের আত্মাকে পবিত্র করিয়াছে। আত্মাকে পবিত্র করার জন্য পুণ্যবান ও নেক ব্যক্তিগণের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা খুব ফলপ্রসূ। মিথ্যা প্রভৃতির ন্যায় মন্দ স্বভাব দূর করা উচিত এবং যে ব্যক্তি পথে চলিতেছে তাহার নিকট রাস্তা জিজ্ঞাসা করা উচিত। নিজের ভুল-ক্রটিগুলিকে সাথে সাথে সংশোধন করা উচিত। ভুল বাহির করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত যেভাবে লেখা সঠিক হয় না, সেভাবেই ভুল বাহির করা ছাড়া স্বভাবও সংশোধিত হয় না। মানুষ এইরূপ প্রাণী যে, তাহার পবিত্রকরণ সাথে সাথে হইলে সে সরল পথে চলে; নতুবা বিগড়াইয়া যায়” (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩০৬ নূতন এডিশন)।

পুণ্যবানগণের সাহচর্যের প্রয়োজনীয়তা

“বিষয়টি এই যে, মৃতদের নিকট সাহায্য চাওয়ার রীতিকে আমি অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখি। ইহা দুর্বল ঈমান লোকদের কাজ যে, তাহারা মৃতদের দিকে মনোনিবেশ করে এবং জীবিতদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকে। খোদাতাআলা বলেন, হযরত ইউনুস আলায়হেস সালামের জীবদ্দশায় লোকেরা তাঁহার নবুওয়ত অস্বীকার করিতে থাকে এবং যেদিন তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন সেদিন তাহারা বলিল, আজ নবুওয়ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্তাআলা কোথাও মৃতদের নিকট যাওয়ার হেদায়াত দেন নাই; বরং কূনূ মাআস সদেকীন (আত্ তওবা ঃ ১১৯)-এর আদেশ দিয়া জীবিতদের সাহচর্যে থাকার আদেশ দিয়াছেন। এই কারণেই আমি আমার বন্ধুগণকে বারবার এখানে আসার ও থাকার জন্য তাকিদ করি। আমি যখন কোন বন্ধুকে এখানে আসার জন্য বলি, আল্লাহ্ খুব জানেন যে, কেবল তাহার অবস্থার উপর দয়া করিয়া সহানুভূতি ও হিতাকাংখার দরুন বলি। আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, ঈমান সঠিক হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ঈমানদার ব্যক্তির সাহচর্যে না থাকে। ইহা এই জন্য যে, যেহেতু স্বভাব বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে সেহেতু একই সময়ে সকল প্রকারের স্বভাববিশিষ্ট লোকের অবস্থা অনুযায়ী বক্তব্য উপদেশদানকারীর মুখ হইতে বাহির হয় না। কোন সময় এইরূপ আসিয়া যায় যখন তাহার বুঝার ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী তাহার রুচি মোতাবেক আলোচনা হইয়া যায়, যদ্বারা সে উপকৃত হয়। মানুষ যদি বারবার না আসে এবং বেশী দিন না থাকে, তবে এমন হইতে পারে যে, এক সময় এইরূপ আলোচনা হইবে যাহা তাহার রুচি মোতাবেক নহে এবং ইহাতে তাহার মন খারাপ হইয়া যাইবে এবং সে সুধারণার পথ হইতে দূরে যাইয়া পড়িবে এবং ধ্বংস হইয়া যাইবে। মোটকথা, কুরআন করীমের লক্ষ্য অনুযায়ী জীবিতদের সাহচর্যে থাকার কথাই প্রমাণিত হয়” (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৯ নূতন এডিশন)।

আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সাহচর্য অত্যাবশ্যক

“আমার জামাতের জন্য ইহা জরুরী বিষয় যে, তাহারা নিজেদের সময় হইতে কিছু সময় বাহির করিয়া এখানে আসিবে এবং আমার সাহচর্যে থাকিয়া এই উদাসীনতার প্রতিকার করিবে, যাহা সাহচর্যে না থাকার যুগে সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐ সকল সন্দেহ দূর করিবে যাহা এই উদাসীনতার কারণে হইয়াছে। ঐ সকল সন্দেহ উপস্থাপন করার এবং আমার নিকট হইতে এগুলির উত্তর শুনার অধিকার তাহাদের আছে। আচ্ছা, দুর্বল শিশু, যে এখনো দুধ পান করার ও মায়ের স্নেহময় কোলের মুখাপেক্ষী, যদি ইহাকে তাহার নিকট হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া হয় তবে কি তোমরা আশা করিতে পার যে, সে বাঁচিয়া থাকিবে ? কখনো নহে। সাবালকত্বের পূর্বের পরিপূর্ণতা ও তত্ত্ব-জ্ঞানের অবস্থা এইরূপই। মানুষ দুর্বল শিশুর ন্যায় হইয়া থাকে। আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সাহচর্য তাহার জন্য অত্যাবশ্যাক হইয়া থাকে। যদি সে তাঁহার নিকট হইতে আলাদা হইয়া যায় তবে তাহার ধ্বংসের আশংকা থাকে” (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪৭৯-৪৮০, নূতন এডিশন)।

“যে ব্যক্তি নিজ মাতা-পিতার সম্মান করে না এবং সাধারণ বিষয়ে, যাহা কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়, তাহাদের আদেশ পালন করে না এবং তাহাদের আদিষ্ট সেবা সম্বন্ধে অবহেলা করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে” (কিশ্তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৮)।

"মানুষের পুণ্যবান হওয়ার প্রথম অবস্থা হইতেছে মায়ের সম্মান করা। ওয়েস কুরনী (রাঃ)-এর জন্য কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালাম ইয়ামেনের দিকে মুখ করিয়া বলিতেন, আমি ইয়ামেনের দিক হইতে খোদার সুগন্ধ পাইতেছি। তিনি (সঃ) ইহাও বলিতেন, সে তাহার মায়ের আজ্ঞানুবর্তিতায় খুব ব্যস্ত থাকে এবং এই কারণে আমার নিকটও আসিতে পারে না। বাহ্যতঃ কথাটি এইরূপ যে, পয়গম্বরে খোদা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মজুদ আছেন, কিন্তু কেবল তাহার মায়ের সেবায় ও আজ্ঞানুবর্তিতায় পূর্ণ ব্যস্ততার দরুন তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না" (মলফুযাত প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৯৫ নূতন এডিশন)।

"যদি কেবলমাত্র ধর্মের কারণে এবং আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি ও তাঁহাকে অগ্রগণ্য করার জন্য মাতা-পিতার নিকট হইতে পৃথক হইতে হয় তবে তাহা হইবে একটি বাধ্যবাধকতা। নিষ্ঠার প্রতি খেয়াল রাখিও এবং নিয়্যতের স্বচ্ছতার প্রতি লক্ষ্য রাখিও এবং তাহাদের জন্য দোয়া করিতে থাক। ------ যাহা হউক, খোদার হক অগ্রগণ্য। অতএব খোদাতাআলাকে অগ্রগণ্য কর এবং নিজেদের তরফ হইতে মাতা-পিতার হক (অধিকার) আদায় করিতে লাগিয়া থাক এবং তাহাদের হকের ব্যাপারে দোয়া করিতে থাক এবং স্বচ্ছ নিয়্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখ" (মলফুযাত, খন্ড ১০, পৃঃ ১৩১)।

সন্তানদের 'তরবীয়ত' (ধর্মীয় প্রশিক্ষণ)

"আমার দৃষ্টিতে শিশু সন্তানদেরকে এমনি এমনি মারপিট করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত, বদ মেযাযী মারপিটকারী যেন হেদায়াত ও প্রতিপালনে নিজেকে খোদার অংশীদার বানাইতে চায়। এক আবেগপ্রবণ ব্যক্তি যখন কোন ব্যাপারে শাস্তি দেয় তখন উত্তেজনায় অগ্রসর হইতে হইতে সে এক দুশমনের রূপ ধারণ করে এবং অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে গিয়া সীমা ছাড়াইয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তি আত্মমর্যাদাশীল হয় এবং নিজের প্রবৃত্তির লাগামকে হাত ছাড়া হইতে না দেয় এবং যদি সে সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হয় এবং ঠাণ্ডা মেজাযের ক্ষমতাবান ব্যক্তি হয়, তবে অবশ্য কোন যথোপযুক্ত সময়ে এক সীমা পর্যন্ত শিশু সন্তানদেরকে শাস্তি দেওয়ার ও চোখ রাঙানোর অধিকার তাহার আছে। কিন্তু ক্রোধের দাস, মাথা গরম ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তির শিশুদের তরবীয়তের জন্য অভিভাবক হওয়া বৈধ নহে। যেভাবে ও যে পরিমাণে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, হায় ! যদি মাতা-পিতা দোয়ায় লাগিয়া যাইত ও শিশু সন্তানদের জন্য বেদনার্ত হৃদয়ে দোয়া করাকে একটি কর্তব্য জ্ঞান করিত। কেননা, শিশু সন্তানদের জন্য মাতা-পিতার দোয়া বিশেষভাবে গৃহীত হয়" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩০৮ নূতন এডিশন)।

"হেদায়াত ও তরবীয়ত প্রকৃতপক্ষেই খোদাতাআলার কাজ। কঠোরভাবে পিছনে লাগিয়া থাকা এবং একটি বিষয়ে জেদাজেদী করিয়া সীমা ছাড়াইয়া যাওয়া অর্থাৎ কথায় কথায় শিশুদেরকে বাধা দেওয়া ও নিষেধ করা ইহা প্রতীয়মান করে যেন আমরাই হেদায়াতের মালিক এবং তাহাদিগকে আমরা নিজেদের মর্জ্জি মোতাবেক একটি পথে লইয়া আসিব। ইহা এক ধরনের গুপ্ত শির্ক। আমার জামাতের ইহা পরিহার করা উচিত। ------ আমিতো আমার শিশু সন্তানদের জন্য দোয়া করি এবং সাধারণভাবে আদব ও শিষ্টাচারের অনুগামী করাই। বাস, ইহার চাইতে অধিক কিছু নহে। অতঃপর

আমার পূর্ণ ভরসা আল্লাহ্‌তাআলার উপর রাখি। যদি তাহাদের মধ্যে সৌভাগ্যের বীজ থাকে যথা সময়ে তাহারা তাজা ও সবুজ হইয়া যাইবে" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩০৯, নূতন এডিশন)।

ওয়াকফে জিন্দেগী (জীবন উৎসর্গীকরণ)

"আমি আমার জামাতকে উপদেশ দেওয়া ও এই কথা তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া আমার কর্তব্য মনে করি। ভবিষ্যতে ইহা শুনা বা না শুনার অধিকার প্রত্যেকের থাকিবে। যদি কেহ মুক্তি চায় এবং পবিত্র জীবনের ও চিরস্থায়ী জীবনের অন্বেষণকারী হয় তবে সে যেন আল্লাহ্‌র জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে এবং প্রত্যেকে এই প্রচেষ্টা ও চিন্তায় লাগিয়া যায় যেন, সে এই দরজা ও মর্যাদা লাভ করে যে, বলিতে পারে আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার কুরবানী, আমার নামায সব আল্লাহ্‌রই জন্য। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায় তাহার আত্মা বলিয়া উঠিবে **আসলামতু লি রব্বিল আলামীন** (সূরা বাকারাঃ ১৩২ অর্থ ঃ আমি (পূর্বেই) সকল জগতের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি – অনুবাদক)। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খোদার মধ্যে বিলীন না হইয়া যায় এবং খোদার সহিত মিলিয়া গিয়া না মরে সে নতুন জীবন পাইতে পারে না। অতএব তোমরা যাহারা আমার সহিত সম্পর্ক রাখ তাহারা দেখিতেছ যে, খোদার জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে আমি আমার জীবনের আসল উদ্দেশ্য মনে করি। অতঃপর তোমরা নিজেদের মধ্যে দেখ তোমাদের মধ্যে কতজন আছে যাহারা আমার এই কাজকে নিজেদের জন্য পসন্দ করে এবং খোদার জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩৮০ নূতন এডিশন)।

"খোদাতাআলার পথে জীবন উৎসর্গ করা, যাহা প্রকৃত ইসলাম, তাহা দুই প্রকারের। একটি এই যে, খোদাতাআলাকেই নিজের উপাস্য, লক্ষ্য ও প্রিয় জ্ঞান করিবে এবং ইবাদত, ভালবাসা, ভীতি ও সন্তুষ্টিতে কোন দ্বিতীয় 'শরীক' (অংশীদার) থাকিবে না। তাঁহার 'তাকদীস', 'তস্‌বীহ্‌' ইবাদত ও সকল প্রকারের আনুগত্যের ও আরাধনার আদব-কায়দা, নির্দেশাবলী ও নিষেধাবলী, সীমা ও আসমানী 'কাযা ও কদর'কে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিবে। সম্পূর্ণ অনস্তিত্বতা ও বিনয়ের সহিত এই সকল আদেশ, সীমা, নিয়ম-কানুন ও তকদীরকে পূর্ণ ভক্তির সহিত গ্রহণ করিবে। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল পবিত্র সত্যতা ও পবিত্র তত্ত্ব-জ্ঞানকে, যাহা তাঁহার ব্যাপক কুদরতের মাধ্যমে এবং তাঁহার সার্বভৌমত্ব ও আধিপত্যের উচ্চ মর্যাদাকে জানার জন্য একটি পন্থা এবং তাঁহার অনুগ্রহরাজীকে চিনার জন্য একটি শক্তিশালী পথপ্রদর্শক ঐগুলিকে উত্তমরূপে জানিয়া নিতে হইবে।

আল্লাহ্‌তাআলার পথে জীবন উৎসর্গ করার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, তাঁহার বান্দাদের সেবায় ও সহানুভূতিতে, সাহায্য-সহায়তায় ও বোঝা বহনে এবং সত্যিকারের বেদনানুভূতিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিবে। অন্যদেরকে আরাম দেওয়ার জন্য কষ্ট করিবে এবং অন্যদেরকে শান্তি দেওয়ার জন্য দুঃখ স্বীকার করিয়া নিবে"(আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন জিলদ-৫, পৃঃ ৬০)।

"যে ব্যক্তি তাহার অস্তিত্বকে খোদার সামনে রাখিয়া দিবে এবং নিজের জীবন তাঁহার পথে উৎসর্গ করিবে এবং পুণ্যকাজ করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হইবে, সে খোদার নৈকট্যের উৎস হইতে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে। এই সকল লোকের না কোন ভয় আছে, না কোন চিন্তা আছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহার সমস্ত শক্তিকে খোদার পথে নিয়োজিত করিবে এবং তাহার কথা, তাহার কর্ম, তাহার তৎপরতা ও আরাম এবং তাহার সমস্ত জীবন কেবল খোদার জন্য হইয়া যাইবে ও প্রকৃত পুণ্য কাজ সম্পাদনে উদ্যোগী থাকিবে, খোদা তাহাকে নিজের নিকট হইতে পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং ভীতি ও দুঃখ হইতে মুক্তি দিবেন।"

"স্মরণ রাখ, ইহার নামই ইসলাম যাহা এখানে বর্ণনা করা হইল। অন্য কথায় কুরআন শরীফে ইহার নাম 'ইস্তেকামত' (দৃঢ়চিত্ততা) রাখা হইয়াছে, যেভাবে ইহাতে এই দোয়া শিখানো হইয়াছে অর্থাৎ আমাদিগকে ইস্তেকামতের পথে প্রতিষ্ঠিত কর, তাহাদের পথে যাহারা তোমার নিকট হইতে পুরস্কার পাইয়াছে এবং যাহাদের জন্য আসমানী দরজা খুলিয়াছে। মনে রাখা দরকার, প্রত্যেক বস্তুর সঠিক গঠন ও অবস্থান ইহার সৃষ্টির লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বুঝিতে হয়। মানব সত্তার সৃষ্টির লক্ষ্য এই যে, মানব জাতিকে খোদার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতএব মানুষের সঠিক গঠন ও অবস্থান এই যে, যেভাবে তাহাকে চিরস্থায়ী আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে সেভাবেই সে প্রকৃতপক্ষে খোদার হইয়া যাইবে। যখন সে তাহার সমস্ত শক্তিসহ খোদার হইয়া যাইবে তখন নিঃসন্দেহে তাহার নিকট পুরস্কার অবতীর্ণ হইবে, যাহাকে অন্য কথায় পবিত্র জীবন বলা যাইতে পারে" (সিরাজউদ্দীন ঈসায়ীকে চার সাওয়ালুঁকা জওয়াব, পৃঃ ১৮, ১৯)।

উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী

"যাহার চরিত্র উত্তম নয়, তাহার ঈমান সম্পর্কে আমি আশংকা করি। কেননা, তাহার মধ্যে অহংকারের একটি শিকড় আছে। যদি খোদা রাজী না হন তবে সে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যখন তাহার নিজের চারিত্রিক অবস্থা এইরূপ তখন অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার তাহার কী অধিকার আছে ? খোদাতাআলা বলেন, **আতামুরূনান্নাসা বিল বিররি ওয়া তানসাওনা আনফুসাহুম** এই কথার অর্থ ইহাই যে, নিজের নফসের (স্বভাবের) কথা ভুলিয়া অন্যের দোষক্রুটি দেখিতে থাকিও না। বরং নিজের দোষ-ক্রুটি দেখা উচিত। যেহেতু সে নিজেই উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অনুসরণ করে না, সেজন্য সে পরিণামে "তোমরা যাহা কর না তাহা কেন বল " এর স্থলাভিষিক্ত হইয়া যায়। নিষ্ঠা ও ভালবাসার সহিত কাহাকেও উপদেশ দেওয়া খুব কঠিন কাজ। কেননা, কোন কোন সময় উপদেশ দেওয়ার মধ্যেও এক গোপন ঈর্ষা ও অহংকার মিলিত হইয়া থাকে। যদি নির্মল ভালবাসার সহিত সে উপদেশ দিয়া থাকিত তবে খোদা তাহাকে এই আয়াতের আওতায় আনিতেন না। বড় সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে প্রথমে নিজের দোষ-ক্রুটি দেখে। যখন সে সদা-সর্বদা নিজের পরীক্ষা নিতে থাকে, তখন বুঝা যায় যে, সে প্রকৃতই একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি (আল্ বদর, ৮ই মার্চ, ১৯০৪ সাল, পৃঃ ৭)।

"আমার পক্ষ হইতে তো উপদেশ ইহাই যে, তুমি নিজেকে উত্তম ও নেক নমুনা বানানোর প্রচেষ্টায় লাগিয়া থাক। যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশ্‌তাদের ন্যায় জীবন না হইয়া

যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কীভাবে বলা যাইতে পারে যে, কেহ পবিত্র হইয়া গিয়াছে। **ইয়াফআলূনা মা ইউ'মারূন** (অর্থ ঃ তাহাদিগকে যাহা আদেশ দেওয়া হয় তাহারা তাহাই করে–অনুবাদক) আল্লাহ্‌তে বিলীন হইয়া যাওয়া এবং নিজের সকল ইচ্ছা ও বাসনাকে পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও আদেশের অনুগামী হইয়া যাওয়া উচিত, যাহাতে নিজের জন্যও এবং নিজের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, শিশু-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও আমার জন্যও রহমতের কারণ হইয়া যাও। বিরুদ্ধবাদীদের জন্য আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ কখনও দেওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "তাহাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যাহারা নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করে এবং কিছু লোক আছে যাহারা মধ্যপন্থী এবং তাহাদের মধ্যে কিছু লোক নেক কাজে অগ্রগামী"। প্রথম দুইটি স্তর নিম্ন পর্যায়ের। 'সাবেকুন বিল খয়রাত' (নেক কাজে অগ্রগামী) হওয়া উচিত। একই অবস্থানে স্থির হইয়া থাকা উত্তম গুণ নহে" (মলফুযাত, দশম খন্ড, পৃঃ ১৩৮, ১৩৯)।

"আমার জামাতে পালোয়ানের ন্যায় শক্তিধর লোকের প্রয়োজন নাই। বরং এইরূপ শক্তিধর লোকের প্রয়োজন যাহারা চরিত্র সংশোধনের জন্য যত্নবান। এই ব্যাপারটি বাস্তব সত্য যে, ঐ ব্যক্তি শক্তিধর নহে, যে পাহাড়কে উহার স্থান হইতে টলাইতে পারে। না, না। প্রকৃত বাহাদুর সে-ই, যে চরিত্র সংশোধনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। অতএব স্মরণ রাখ, সকল ক্ষমতা ও শক্তি চারিত্রিক সংশোধনে ব্যয় করিতে হইবে। কেননা, ইহাই প্রকৃত শক্তি ও বীরত্ব" (মলফুযাত, খন্ড ১, পৃঃ ১৪০ মুদ্রিত ১৯৬০)।

সত্যবাদিতা

"সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। কেননা, তিনি দেখিতেছেন তোমাদের হৃদয় কীরূপ। মানুষ কি তাঁহাকেও ধোঁকা দিতে পারে ? তাঁহার সহিতও কি প্রতারণা চলিতে পারে ? অত্যন্ত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে তাহার মিথ্যার বেসাতি এই পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেয় যেন খোদা নাই। তখন তাহাকে খুব শীঘ্র ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় এবং খোদাতাআলা তাহার কোন পরোয়াই করেন না। .... এইরূপ হৃদয় তৈরী কর যাহা গরীব ও মিস্‌কীন (বিনয় ও নম্রতা অর্থে) হইবে। কোন আপত্তি না করিয়া অম্লান বদনে আদেশ মান্যকারী হইয়া যাও, যেভাবে শিশু তাহার মায়ের কথা মান্য করে" (এযালায়ে আওহাম, পৃঃ ৪৪৯)।

"প্রকৃত সত্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ প্রবৃত্তির ঐ সকল বাসনা-কামনা হইতে পৃথক না হয় যাহা সত্যবাদিতা হইতে বিরত রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত অর্থে সত্যবাদী সাব্যস্ত হইতে পারে না। কেননা, যদি মানুষ কেবল এইরূপ ক্ষেত্রে সত্য বলে যাহাতে তাহার মোটেই ক্ষতি নাই এবং তাহার সম্মান বা ধন-সম্পদ বা প্রাণের ক্ষতির সময় যদি সে মিথ্যা বলে এবং সত্য বলা হইতে নীরব থাকে, তবে পাগল ও শিশুদের উপর তাহার কী শ্রেষ্ঠত্ব আছে ? পাগল এবং নাবালক ছেলেরাও কি এইরূপ সত্য বলে না ? পৃথিবীতে এইরূপ কাহাকেও পাওয়া যাইবে না যে, কোন উদ্দেশ্য ছাড়া খামাখা মিথ্যা বলে। অতএব এইরূপ সত্য, যাহা কোন ক্ষতির সময় পরিত্যাগ করা হয়, তাহা কখনো প্রকৃত উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। সত্য বলার বড় উত্তম পরিস্থিতি ও সুযোগ উহাই যাহাতে নিজের জীবন বা ধন-সম্পদ বা মান-সম্মানের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে" (ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী, পঃ ৪৬)।

"অন্যায়ের উপর জিদ করিয়া সত্যবাদিতাকে হত্যা করিও না। সত্যকে স্বীকার কর যদি তাহা এক শিশুর নিকটেও করিতে হয়। যদি বিরুদ্ধবাদীর পক্ষ হইতে সত্য পাও তবে তৎক্ষণাৎ নিজের শুষ্ক যুক্তিবিদ্যা পরিত্যাগ কর। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও এবং সত্য সাক্ষী দাও, যেভাবে আল্লা জাল্লা শানহু বলেন, "প্রতিমার নোংরামী হইতে বাঁচ এবং মিথ্যা হইতেও বাঁচ।" কেননা, ইহা প্রতিমা হইতে কম নহে। যে-বস্তু সত্য হইতে তোমাদের মুখ ফিরাইয়া রাখে, উহাই তোমাদের পথে প্রতিমা। সত্য সাক্ষ্য দাও যদি তাহা তোমাদের পিতা বা ভ্রাতা ও বন্ধুদের বিরুদ্ধেও হয়। কোন শত্রুতাও তোমাদিগকে ন্যায়-বিচার হইতে যেন বিরত না রাখে। পরস্পরের মধ্যে কার্পণ্য, ঈর্ষা, ঝগড়া-ঝাটি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা পরিত্যাগ কর এবং এক হইয়া যাও। কুরআন শরীফের বড় আদেশ দুইটি। একটি হইল তওহীদ ও মহান আল্লাহ্‌তাআলার ভালবাসা ও আনুগত্য। দ্বিতীয়টি হইল নিজের ভাইদের ও মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি" (রূহানী খাযায়েন, খন্ড ৩, এযালায়ে আওহাম, পৃঃ ৫৫০)।

আনুগত্য

"আনুগত্য একটি বড় কঠিন বিষয়। সাহাবা কেরাম (রাঃ)-গণের আনুগত্য ছিল প্রকৃত আনুগত্য। যখন একবার ধন-সম্পদের প্রয়োজন দেখা দিল তখন হযরত উমর (রাঃ) তাঁহার সম্পদের অর্ধেক অংশ নিয়া আসেন। আবূ বকর (রাঃ) তাঁহার গৃহের মাল-পত্র বিক্রয় করিয়া যত টাকা পাইলেন তাহা নিয়া আসেন। যখন খোদার পয়গম্বর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত উমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি ঘরে কি রাখিয়া আসিয়াছ তখন তিনি উত্তর দিলেন অর্ধেক অংশ। অতঃপর তিনি আবূ বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের ধন-সম্পদে যতখানি পার্থক্য আছে ততখানি তোমাদের আমলে (নেক কাজে) পার্থক্য আছে।

আনুগত্য কি সহজ ব্যাপার ? যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে আনুগত্য করে না সে এই সেলসেলার বদনাম করে" (মলফুযাত, খন্ড ৪, পৃঃ ৩৪)।

"আনুগত্য কোন ছোট খাট বিষয় নয় এবং সহজ ব্যাপার নয়। ইহাও একটি মৃত্যু। যেভাবে একজন জীবিত মানুষের চামড়া উঠাইয়া ফেলা হয়, আনুগত্য তদ্রূপই" (প্রাগুক্ত টীকা)।

ন্যায়-বিচার ও উপকার—অতি নিকট আত্মীয়সুলভ আচরণ

"খোদা তোমাদের নিকট হইতে কী চান ? বাস, ইহাই যে, তোমরা সকল মানুষের সহিত ন্যায়-বিচার কর। অতঃপর ইহার চাইতে অধিক এই যে, তাহাদেরও উপকার কর যাহারা তোমাদের কোন উপকার করে নাই। অতঃপর ইহার চাইতে অধিক এই যে, তোমরা খোদার সৃষ্টির প্রতি এইরূপ সহানুভূতি দেখাইবে যেন তোমরা তাহাদের প্রকৃত আত্মীয়, যেভাবে মা তাহার শিশু সন্তানের জন্য করিয়া থাকে। কেননা, উপকারের মধ্যে

আত্ম-প্রচারের একটি উপাদানও গোপন থাকে এবং উপকারকারী তাহার উপকার জানাইয়াও দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি মায়ের ন্যায় প্রকৃতিগত আবেগে উপকার করে সে কখনো আত্ম-প্রচার করিতে পারে না। অতএব পুণ্য কাজের শেষ স্তর প্রকৃতিগত আবেগ, যাহা মায়ের ন্যায় হয়" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৪০, ৪১ মুদ্রণ ১৯৫২ইং)।

"ন্যায়-বিচারের পরবর্তী পর্যায় উপকার। অর্থাৎ কোন বিনিময় ছাড়া উপকার করিবে" (আল্ হাকাম, খন্ড ১০ এর ৩৭ পৃঃ তাং ২৪শে অক্টোবর, ১৯০৬ইং)।

"উপকার একটি বড় উত্তম জিনিষ। ইহা দ্বারা মানুষ তাহার বড় বড় বিরুদ্ধবাদীকে অধীন করিয়া ফেলে। বস্তুতঃ শিয়ালকোটে এক ব্যক্তি ছিল, যে সকলের সহিত ঝগড়া করিত। এইরূপ কোন ব্যক্তিকে দেখা যাইত না যাহার সহিত তাহার আপোষ হয়। এমনকি তাহার ভাই ও আত্মীয়-স্বজনেরাও তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার সহিত কোন কোন সময় আমি মামুলী ধরনের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম। ইহার বদলে সে কখনো আমার সহিত মন্দ আচরণ করে নাই; বরং যখন আমার সহিত দেখা করিত খুব ভদ্রতার সহিত কথা-বার্তা বলিত। এইভাবে এক আরব আমার এখানে আসিল। সে ওহাবীদের ঘোরতর বিরোধী ছিল। এমনকি যখন তাহার সামনে ওহাবীদের কথা বলা হইত তখন গালাগালি শুরু করিয়া দিত। সে এখানে আসিয়াও কঠোর গালি-গালাজ দেওয়া শুরু করিয়া দিল এবং ওহাবীদিগকে মন্দ কথা বলিতে লাগিল। আমি ইহার কিছুই পরোয়া না করিয়া তাহার খুব যত্ন করিলাম এবং উত্তমরূপে তাহাকে আপ্যায়ন করিলাম। একদিন যখন সে ক্রোধান্বিত হইয়া ওহাবীদিগকে খুব গালি দিতেছিল তখন কোন এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, যাহার গৃহে তুমি মেহমান হইয়া আছ তিনিও তো ওহাবী। ইহাতে সে নীরব হইয়া গেল। ঐ ব্যক্তির আমাকে ওহাবী বলা ভুল ছিল না। কেননা, কুরআন শরীফের পর সহী হাদীসের উপর আমল করাই আমি জরুরী মনে করি। যাহা হউক ঐ ব্যক্তি কয়েকদিন পরে চলিয়া গেল। ইহার পর একবার তাহার সহিত আমার লাহোরে দেখা হইল। যদিও সে ওহাবীদের চেহারা দেখাও পসন্দ করিত না, কিন্তু যেহেতু আমি উত্তমরূপে তাহার মেহমানদারী করিয়াছিলাম এই জন্য তাহার ঐ সকল আবেগ উত্তেজনা দমিয়া গেল এবং সে বড়ই মেহেরবানী ও ভালবাসার সহিত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। বস্তুতঃ সে খুব বিনয়ের সহিত আমাকে সঙ্গে নিয়া গেল এবং ছোট একটি মসজিদে আমাকে বসাইল। সে এই মসজিদের ইমাম ছিল। সে নিজেই চাকরদের ন্যায় আমাকে পাখা করিতে লাগিল এবং খুব খোশামোদ করিতে লাগিল যে, কিছু চা-নাস্তা খাইয়া যাইবেন। অতএব দেখ উপকার হৃদয়কে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলে" (মলফুযাত, নবম খন্ড, পৃঃ ৩০২)।

"যদিও উপকারের মর্যাদা ন্যায়-বিচারের চাইতে বেশী এবং ইহা বড় ভারী নেকী, কিন্তু কখনো কখনো ইহা সম্ভব যে, উপকারকারী তাহার উপকারের কথা প্রচার করিবে। কিন্তু এইগুলির উর্ধ্বে একটি মর্যাদা আছে যে, মানুষ এইভাবে নেকী করিবে, যাহা হইবে ব্যক্তিগত ভালবাসারূপে। ইহাতে উপকার প্রদর্শনেরও কোন অংশ থাকে না, যেভাবে মা তাহার শিশু সন্তানের লালন পালন করে। মা এই লালন পালনের জন্য কোন পুরস্কার ও বিনিময়ের প্রত্যাশী হয় না। বরং একটি প্রকৃতিগত আবেগের দরুন বাচ্চার জন্য নিজের সকল সুখ ও আরাম ত্যাগ করিয়া থাকে। এমনকি যদি কোন বাদশাহ্ কোন মাকে আদেশ দেয় যে, তুমি তোমার বাচ্চাকে দুধ পান করাইও না। যদি ইহাতে বাচ্চা

বিনষ্টও হইয়া যায় তাহাকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না তবে কি মা এইরূপ আদেশ শুনিয়া খুশী হইবে এবং এই আদেশ পালন করিবে ? কখনো নহে। বরং সে মনে মনে এইরূপ বাদশাহ্‌কে গালি দিবে কেন সে এইরূপ আদেশ দিয়াছে। অতএব এই পন্থায় নেকী কর যেন এইরূপ স্বভাবগত মর্যাদায় পৌঁছিয়া দাও। কেননা, কোন ব্যক্তি উন্নতি করিতে করিতে যদি স্বভাবগত পর্যায়ে পৌঁছিয়া যায় তবে সে 'কামেল' (পরিপূণ) হয়" (মলফুযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ২৮৩)।

ধৈর্য

"ধৈর্য ধর। কেননা, ইহা ধৈর্য ধারণ করার সময়। যে ধৈর্য ধারণ করে খোদাতাআলা তাহাকে বড় করেন। প্রতিশোধের দৃষ্টান্ত মদের ন্যায়। যখন অল্প অল্প পান করিতে আরম্ভ করে তখন ইহা বাড়িতে থাকে। এমনকি তৎপর সে ইহা ছাড়িতে পারে না এবং সীমালংঘন করে। এইভাবে প্রতিশোধ লইতে লইতে মানুষ যুলুমের সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়" (মলফুযাত, খন্ড ৬, পৃঃ ৩২, ৩৩)।

"নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখ, বিবেক ও উত্তেজনার মধ্যে বিপজ্জনক দুশমনী আছে। যখন উত্তেজনা ও রাগ আসে তখন বিবেক তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু যে ধৈর্য ধারণ করে ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখায় তাহাকে একটি জ্যোতিঃ দেওয়া হয় যদ্দারা তাহার বিবেক ও বুদ্ধির শক্তিতে একটি নূতন আলো সৃষ্টি হইয়া যায়। অতঃপর জ্যোতিঃ হইতে জ্যোতির সৃষ্টি হয়। যেহেতু রাগ ও উত্তেজনার অবস্থায় মন ও মস্তিষ্ক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, সেজন্য অন্ধকার হইতে অন্ধকার সৃষ্টি হয়" (মলফুযাত, খন্ড ৩, পৃঃ ১৮০)।

"বারবার এইরূপ হয় যে, এক ব্যক্তি বড় উত্তেজনার সহিত বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিরুদ্ধাচরণে ঐ পন্থা অবলম্বন করে যাহা ফাসাদ সৃষ্টিকারী পন্থা। ইহাতে শ্রবণকারীদের মধ্যে উত্তেজনার উদ্রেক হয়। কিন্তু যখন সে নরম উত্তর পায় এবং গালির মোকাবেলা করা হয় না তখন সে নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়ে এবং সে নিজের আচরণে লজ্জিত হইতে থাকে।

আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, ধৈর্যকে হাত ছাড়া করিও না। ধৈর্যের হাতিয়ার এইরূপ যে, তোপ দ্বারা ঐ কাজ হয় না যাহা ধৈর্যের দ্বারা হয়। ধৈর্যই হৃদয়কে জয় করিয়া নেয়। নিশ্চিতরূপে মনে রাখ, আমার খুব দুঃখ হয় যখন আমি এই কথা শুনি যে, অমুক ব্যক্তি এই জামাতের হইয়াও কাহারো সহিত ঝগড়া করিয়াছে। এই আচরণকে আমি কখনো পসন্দ করি না। খোদাতাআলাও চাহেন না যে, ঐ জামাত যাহারা পৃথিবীতে এক নমুনা সাব্যস্ত হইবে তাহারা এইরূপ পথ অবলম্বন করে যাহা তাকওয়ার পথ নহে" (মলফুযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ২০৩, ২০৪)।

"যখন আমি ধৈর্য ধারণ করি তখন তোমাদেরও ধৈর্য ধারণ করা উচিত। বৃক্ষের চাইতে তো শাখা বড় হয় না। তোমরা দেখ ইহারা কতদিন পর্যন্ত গালি দেয়। অবশেষে ইহারাই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তাহাদের গালি-গালাজ এবং ষড়যন্ত্র নিশ্চয় আমাকে ক্লান্ত করিতে পারিবে না। যদি আমি খোদাতাআলার পক্ষ হইতে না হইতাম তবে নিঃসন্দেহে আমি তাহাদের গালি-গালাজে ভয় পাইয়া যাইতাম। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি খোদা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছেন। অতএব আমি এই সকল তুচ্ছ কথার কি পরোয়া করিব" (মলফুযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ২০৪)।

"আমি তোমাদিগকে এই কথাও বলিয়া দিতেছি যে, আল্লাহ্‌তাআলা এতখানি এই ব্যাপারে সমর্থন করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এই জামাতের হইয়াও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত আচরণ না করে তবে সে স্মরণ রাখুক, সে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত নহে। রাগ ও উত্তেজনার বড় কারণ এই হইতে পারে যে, আমাকে অশ্লীল গালি-গালাজ করা হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি খোদার উপর সোপর্দ্দ করিয়া দাও। তোমরা ইহার ফয়সালা করিতে পারিবে না। আমার ব্যাপারটি খোদার উপর ছাড়িয়া দাও। তোমরা এই সকল গালি-গালাজ শুনিয়াও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত আচরণ কর। তোমরা জান না আমি এই সকল লোকের নিকট হইতে কতখানি গালি-গালাজ শুনি। প্রায়ই এইরূপ হয় যে, আমার নিকট অশ্লীল গালি-গালাজপূর্ণ চিঠি আসে এবং খোলা কার্ডে গালি-গালাজ করা হইয়া থাকে। বেয়ারিং চিঠিতে আসে যাহার মাশুলও দিতে হয়। অতঃপর যখন আমি পড়ি তখন দেখি যে, এইগুলি গালি-গালাজের স্তুপ" (মলফুযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ২০৪)।

(খোদার উপর) ভরসা

"যে সকল লোক তাহাদের বাহুবলের উপর ভরসা করে এবং খোদাতাআলাকে পরিত্যাগ করে তাহাদের পরিণাম ভাল হয় না। খোদাতাআলার উপর ভরসা করার অর্থ এই নহে যে, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাক। বরং (ইহার অর্থ এই যে;) খোদাতাআলার সৃষ্ট উপকরণ কাজে লাগাও এবং তাঁহার দেওয়া শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ কর। অতঃপর ফলাফলের জন্য খোদাতাআলার উপর ভরসা করাই প্রকৃত পথ এবং ইহাই খোদাতাআলার জন্য কদর" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৪৪ নূতন এডিশন)।

"এই কথাও স্মরণ রাখ, বিপদের যখমের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার উপর ভরসা করার ন্যায় বেশী শক্তিদায়ক ও আরামপ্রদ কোন মলম নাই। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার উপর ভরসা করে সে কঠিন হইতে কঠিনতর মুশ্‌কিল ও বিপদেও মনের গহীনে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। সে তাহার হৃদয়ে তিক্ততা ও আযাব অনুভব করে না। বড়জোর এই বিপদের পরিণতি এই হইতে পারে যে, যদি তকদীর অলংঘণীয় হয় তবে মৃত্যু আসিবে। কিন্তু ইহাতে কী হইল ? পৃথিবী কোন এমন স্থানই নহে যেখানে কেহ চিরকাল থাকিতে পারিবে। অবশেষে একদিন ও একটি সময় সকলের নিকটই আসে যখন এই পৃথিবী ছাড়িতে হয়। তাহা হইলে যদি তাহার মৃত্যু আসিয়া যায় তবে আপত্তির কি আছে ও মু'মিনের জন্য তো এই মৃত্যু আরো আনন্দদায়ক ও বন্ধুর সহিত মিলনের মাধ্যম হইয়া যায়। ইহা এই জন্য যে, সে আল্লাহ্‌তাআলার উপর পরিপূর্ণ ঈমান এবং তাঁহার কুদরতের উপর ভরসা করে এবং সে জানে পরকাল তাহার জন্য চিরস্থায়ী শান্তির জায়গা"(মলফুযাত, খন্ড ৮, পৃঃ ৪৫)।

"প্রকৃত রিয্‌কের মালিক খোদাতাআলা। ঐ ব্যক্তি যে তাঁহার উপর ভরসা করে সে কখনো রিয্‌ক হইতে বঞ্চিত থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব প্রকারে ও সব জায়গা হইতে তাঁহার উপর ভরসাকারী ব্যক্তির জন্য রিয্‌ক পৌঁছাইয়া থাকেন। খোদাতাআলা বলেন, যে আমার উপর ভরসা করে ও নির্ভর করে আমি তাহার জন্য আকাশ হইতে ও ভূতল হইতে বর্ষণ করি। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির খোদাতাআলার উপর ভরসা করা উচিত" (মলফুযাত, খন্ড ৯, পৃঃ ৩৬০)।

ক্ষমা ও মার্জনা এবং পারস্পরিক ভালবাসা

"যে ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করিতে চাহে না এবং বিদ্বেষপরায়ণ, সে আমার জামাতভুক্ত নহে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৯ নূতন এডিশন)।

"তোমরা পরস্পরের মধ্যে শীঘ্র আপোষ কর এবং নিজেদের ভ্রাতাগণের পাপ ক্ষমা কর। কেননা, ঐ ব্যক্তি দুষ্ট, যে তাহার ভাই-এর সহিত আপোষ করিতে সম্মত নহে। সে কর্তিত হইয়া যাইবে। কেননা, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। তোমরা নিজেদের প্রবৃত্তির দাসত্ব সকল দিক হইতে ছাড়িয়া দাও এবং পারস্পরিক অসন্তুষ্টি পরিত্যাগ কর। সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও যেন তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হও" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ২৫, ২৬)।

"কতই না হতভাগ্য ঐ ব্যক্তি, যে এই সকল কথা মানে না যাহা খোদার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে এবং আমি বর্ণনা করিয়াছি। যদি তোমরা চাহ যে, আকাশে খোদা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হউন তবে তোমরা পরস্পর এইরূপ এক হইয়া যাও যেন তোমরা একই মায়ের পেটের দুই ভাই। তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে নিজ ভাই এর পাপ অধিক ক্ষমা করে এবং ঐ ব্যক্তি মন্দ প্রকৃতির, যে জিদ করে এবং ক্ষমা করে না। অতএব আমার মধ্যে তাহার কোন অংশ নাই। খোদার অভিসম্পাত হইতে ভীত থাক। তিনি পবিত্র ও আত্মাভিমানী" (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ২৬)।

"কতইনা ভাগ্যবান ঐ সকল লোক, যাহারা নিজেদের হৃদয়কে পরিষ্কার করে এবং নিজেদের হৃদয়কে সকল প্রকার পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র করিয়া নেয় এবং নিজেদেরকে খোদার সহিত বিশ্বস্ততার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। কেননা, তাহাদিগকে কখনো বিনষ্ট করা হইবে না। ইহা সম্ভব নহে যে, খোদা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন। কেননা, তাহারা খোদার ও খোদা তাহাদের। প্রত্যেক বিপদের সময় তাহাদিগকে রক্ষা করা হইবে। নির্বোধ ঐ দুশমন, যে তাহাদের শত্রুতা করে। কেননা, তাহারা খোদার কোলে আছে এবং খোদা তাহাদের সহায়" (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ৪০)।

"আমি চাহি না যে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে একে অন্যকে ছোট বা বড় মনে করুক, বা একে অন্যের উপর অহংকার করুক, বা একে অন্যকে হেয় জ্ঞান করুক। খোদা জানেন কে বড় বা কে ছোট। ইহা এক ধরনের তাচ্ছিল্য, যাহার তুচ্ছ জ্ঞান করার প্রবণতা আছে। ভয় আছে এই তাচ্ছিল্য বীজের ন্যায় বাড়িবে এবং তাহার ধ্বংসের কারণ হইয়া যাইবে। কোন কোন ব্যক্তি বড়দের সহিত মিলিত হইলে বড় সৌজন্যের সহিত আচরণ করে। কিন্তু বড় সে, যে দুর্বলের কথা বিনয়ের সহিত শুনে, তাহার মনঃস্তুষ্টি করে, তাহার কথার সম্মান করে, এবং কোন কড়া কথা বলে না যদ্দারা কষ্ট হয়। ----------- যে ব্যক্তি কাহাকেও কড়া কথা বলে সে মরিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেই অনুরূপ পরিস্থিতির শিকার না হইবে। নিজেদের ভাইদিগকে তুচ্ছ মনে করিও না। যখন সকলেই একই উৎস হইতে পানি পান কর তখন কে জানে কাহার ভাগ্যে অধিক পানি আছে" (মলফুযাত, খন্ড ১, পৃঃ ২৩)।

অধীনস্থ ও গরীবের উপর দয়া

"তোমরা অধীনস্থদের উপর, নিজেদের স্ত্রীগণের উপর, এবং নিজেদের প্রিয় ভ্রাতাগণের উপর দয়া কর, যেন আকাশে তোমাদের উপরও দয়া করা হয়"(কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ২৭)।

"মোট কথা, মানবজাতির প্রতি স্নেহ-মমতা ও তাহাদের সহিত সহানুভূতি করা অনেক বড় ইবাদত এবং আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইহা একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, এই ক্ষেত্রে বড় দুর্বলতা প্রদর্শন করা হইতেছে। অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হইতেছে এবং তাহাদের সহিত ঠাট্টা করা হইতেছে। তাহাদের খোঁজ-খবর নেওয়া ও তাহাদের বিপদ-আপদে সাহায্য করা বড় ব্যাপার। যে সকল লোক গরীবদের সহিত সদ্ব্যবহার করে না, বরং তাহাদেরকে হেয় মনে করে তাহাদের সম্পর্কে আমার এই ভয় আছে যে, তাহারা নিজেরাই না বিপদে পড়িয়া যায়। আল্লাহ্‌তাআলা যাহার উপর ফযল করিয়াছেন তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইহাই যে, সে তাঁহার সৃষ্টির উপকার করিবে ও তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে এবং খোদা-প্রদত্ত এই ফযলের উপর অহংকার করিবে না এবং পশুর ন্যায় গরীবদিগকে পিষিয়া ফেলিবে না" (মলফুযাত, খণ্ড ৮, পৃঃ ১০৩, ১০৪)।

প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার

"যাহারা নিজেদের প্রতিবেশীকে ছোট ছোট জিনিষ হইতেও বঞ্চিত রাখে তাহারা আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্, পৃঃ ৩৯)।

সহানুভূতি

"আমার উপদেশ ইহাই যে, দুইটি বিষয় স্মরণ রাখ। প্রথমতঃ খোদাকে ভয় কর। দ্বিতীয়তঃ নিজ ভ্রাতাগণের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি কর যেভাবে নিজের প্রতি করিয়া থাক। যদি কাহারো দ্বারা কোন অপরাধ বা ভুল হইয়া যায় তবে তাহাকে ক্ষমা করা উচিত। তাহার উপর আরো জোর দিবে না এবং প্রতিশোধপরায়ণতার অভ্যাস গড়িয়া তুলিবে না" (মলফুযাত খন্ড ৯, পৃঃ ৭৪)।

"তোমাদের সহানুভূতি কেবল মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিও না; বরং সকলের প্রতি সহানুভূতি কর। যদি একজন হিন্দুর প্রতি সহানুভূতি না কর তবে ইসলামের সদুপদেশ তাহার নিকট কীভাবে পৌছাইবে ? খোদা সকলের প্রভু। হাঁ, মুসলমানদের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতি কর। অতঃপর মুত্তাকী ও নেক বান্দাদের প্রতি আরো বিশেষভাবে সহানুভূতি কর" (মলফুযাত, খন্ড ৬, পৃঃ ৩৭১ মুদ্রিত ৮/১১/১৯৬৩)।

"আমার অবস্থাতো এই যে, যদি কাহারো ব্যথা হয় এবং আমি নামাযে রত আছি এমতাবস্থায় যদি আমার কানে তাহার আওয়াজ পৌছিয়া যায় তখনতো আমি চাই যে, নামায ভাঙ্গিয়াও যদি তাহার উপকার করিতে পারি তবে তাহা করি এবং যতখানি সম্ভব তাহার প্রতি সহানুভূতি করি। কোন ভাই-এর বিপদে ও কষ্টে তাহাকে সঙ্গ না দেওয়া উত্তম চরিত্রের পরিপন্থী। যদি তুমি তাহার জন্য কিছুই করিতে না পার তবে অন্ততঃপক্ষে দোয়াই কর। নিজের লোকদের কথা দূরে থাক, আমিতো বলি অন্যদের এবং হিন্দুদের সহিতও উত্তম চরিত্রের নমুনা দেখাও এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি কর। কখনো বেপরোয়াভাব থাকা উচিত নহে" (মলফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০৫, নূতন এডিশন)।

"পারস্পরিক সহানুভূতির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তাআলা তিনটি স্তর রাখিয়াছেন। ইহার উল্লেখ ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুবিল আদলি ওয়াল ইহ্‌সানি ওয়া ঈতাইযিল কুর্‌বা – আয়াতে

করা হইয়াছে। এই আয়াতে সব চাইতে ছোট নেকী সাব্যস্ত করা হইয়াছে 'আদল'-কে (ন্যায়-বিচার)। যদি কেহ তোমার সহিত সদাচরণ করে এবং তোমার উপকার করে তবে তুমিও তাহার সহিত তদ্রূপই কর। ইহার পরের স্তর হইল 'ইহসান' (উপকার)। যদিও ইহা ন্যায়-বিচারের চাইতে শ্রেয়ঃ, কিন্তু ইহাতেও একটি খুঁত আছে। উপকারকারীর হৃদয়ে লোক দেখানো ভাব ও অহং আসিতে পারে এবং কোন উপলক্ষ্যে খোঁটা দিতে পারে যে, আমি তোমার অমুক উপকার করিয়াছি। কিন্তু 'ঈতাইযিল কুর্‌বা ' (নিজ আত্মীয়সুলভ আচরণ)-এর মধ্যে লোক দেখানো ভাব ও অহং এর নাম-নিশানা থাকে না। যেভাবে মা তাহার বাচ্চাকে প্রকৃতিগত আবেগে লালন-পালন করে এবং নিজের জীবন-মৃত্যুর খেয়াল থাকে না এবং না বাচ্চার নিকট হইতে উপকারের আশা ও ক্ষতির আশংকা করে এবং সে অবলীলায় তাহার সকল সুখ ও আরাম এই বাচ্চার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেয়, সেভাবে প্রকৃতিগত আবেগের দরুন মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি করার নাম 'ঈতাইযিল কুর্‌বা ' অর্থাৎ নিকট আত্মীয়সুলভ আচরণ। এই ধারাবাহিকতায় খোদাতাআলার ইচ্ছা এই যে, যদি তোমরা পূর্ণ নেক হইতে চাও তবে তোমাদের নেকীকে 'ঈতাইযিল কুর্‌বা' অর্থাৎ প্রকৃতিগত পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাও। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু উন্নতি করিতে করিতে উহার এই প্রকৃতিগত কেন্দ্র পর্যন্ত না পৌঁছে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা পরিপূর্ণ মর্যাদা অর্জন করিতে পারে না" (আল্ বদর, খন্ড ৪, পৃঃ ২, তারিখ ১০ই জানুয়ারী, ১৯০৫ইং)।

"এস্থানে আমি এই উপদেশ লেখাও সমীচীন মনে করি যে, প্রত্যেকে তাহার ভাই-এর সহিত পূর্ণ সহানুভূতি ও ভালবাসার আচরণ করিবে এবং সহোদর ভাইদের চাইতেও তাহাদের 'কদর' বেশী করিবে। তাহাদর সহিত শীঘ্র আপোষ করিয়া নিবে। হৃদয়ের পঙ্কিলতা দূর করিয়া ফেলিবে। অভ্যন্তর পরিচ্ছন্ন করিবে। তাহাদের প্রতি এক বিন্দু হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। কিন্তু যদি কেহ জানিয়া বুঝিয়া এই সকল শর্ত অমান্য করে, যাহা ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং তারিখের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, এবং নিজের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড হইতে বিরত না হয় তবে তাহাকে এই সেলসেলা হইতে বহিষ্কৃত বলিয়া গণ্য করা হইবে" (এযালায়ে আওহাম, পৃঃ ৪৬০, ৪৬১)।

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, মানুষের ঈমান কখনো সঠিক হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাহার আরামের উপর তাহার ভাই-এর আরামকে যথাসাধ্য প্রাধান্য না দিবে। যদি আমার এক ভাই আমার সামনে তাহার বার্ধক্য ও দুর্বলতা সত্ত্বেও মাটিতে শোয় এবং আমি আমার উত্তম স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সত্ত্বেও চারপাই দখল করিয়া লই যাহাতে সে উহাতে বসিয়া না পড়ে, তাহা হইলে আমার অবস্থার উপর আক্ষেপ করিতে হইবে যদি আমি না উঠি এবং ভালবাসা ও সহানুভূতির সহিত আমার চারপাই তাহাকে না দিই এবং নিজের জন্য মাটির বিছানা পসন্দ না করি। যদি আমার ভাই অসুস্থ হয় এবং কোন ব্যথায় অসহায় হয়, তাহা হইলে আমার অবস্থার উপর আফসোস করিতে হইবে যদি আমি তাহার সম্মুখে আরামে শুইয়া থাকি এবং তাহার জন্য যতদূর আমার ক্ষমতায় কুলায় তাহাকে আরাম দেওয়ার চেষ্টা না করি" (শাহাদাতুল কুরআন, পৃঃ ৯৯, ১০০)।

মেহমাননেওয়াযী (অতিথিপরায়ণতা)

"সর্বদা আমার লক্ষ্য থাকে কোন মেহমানের যেন কষ্ট না হয়। বরং সর্বদা ইহার জন্য তাকিদ করিতে থাকি যে, যতটুকু সম্ভব মেহমানদিগকে আরাম দিতে হইবে। মেহমানের হৃদয় আয়নার ন্যায় নাজুক হইয়া থাকে এবং সামান্য আঘাত লাগিলেই

ভাঙ্গিয়া যায়। ইতোপূর্বে আমি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম যে, নিজেও মেহমানদের সঙ্গে খাইতাম। কিন্তু যখন হইতে অসুস্থতা বাড়িয়া গেল বরং পরহেযীখাদ্য (সব খাদ্যদ্রব্য না খাইয়া বাছিয়া বাছিয়া খাওয়া রুগীদের ক্ষেত্রে যেমনটি হইয়া থাকে) গ্রহণ আরম্ভ করিতে হইল তখন হইতে ঐ ব্যবস্থা আর রহিল না। ইহার সাথে সাথে মেহমানের সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে, জায়গার সংকুলান হইতেছিল না। এই জন্য বাধ্য হইয়া আমি পৃথক হইয়া গেলাম। আমার তরফ হইতে প্রত্যেক মেহমানের অনুমতি আছে যে, তিনি তাহার অসুবিধা জানাইয়া দিবেন। কোন কোন লোক অসুস্থ হন। তাহাদের জন্য পৃথক খাদ্যের ব্যবস্থা হইতে পারে" (মলফুযাত, খন্ড ৫, পৃঃ ৩০৬, ৩০৭, মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৬৩)।

"তিনি পাকশালার ব্যবস্থাপনাকে তাকিদ করেন যে ঃ

আজকাল মৌসুমও খারাপ। যত লোক আসিয়াছেন তাহারা সকলে মেহমান এবং মেহমানের আরাম হওয়া উচিত। এই জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা উত্তম হইতে হইবে। যদি কেহ দুধ চায় তাহাকে দুধ দাও। চা চাহিলে চা দাও। কেহ অসুস্থ হইলে তাহার অবস্থানুযায়ী তাহাকে পৃথক খাদ্য পাকাইয়া দাও" (মলফুযাত, খন্ড ৬, পৃঃ ১১৯)।

"দেখ, অনেক মেহমান আসিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে তোমরা কাউকে কাউকে চিনিয়া থাক এবং কাউকে কাউকে চিন না। এই জন্য সকলকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়া আদর-আপ্যায়ন করা উচিত। শীতের মৌসুম। চা পান করাও। কাহারো যেন কষ্ট না হয়। তোমাদের সম্পর্কে আমি সুধারণা রাখি যে, তোমরা মেহমানগণকে আরাম দিয়া থাক। তাহাদের সকলের সেবা কর। যদি কাহারো কামরায় বা ঘরে ঠান্ডা লাগে তবে লাকড়ী বা কয়লার ব্যবস্থা করিয়া দাও" (মলফুযাত, খন্ড ৬, পৃঃ ২২৬)।

মন্দ চরিত্র

"যে ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ এবং কুঅভ্যাস হইতে যথা – মদ্যপান, জুয়াখেলা, লোলুপ দৃষ্টি, বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচ গ্রহণ তদ্রূপ অন্যান্য আচরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত হয় না এবং তওবা করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৮, ১৯৫২ সন মুদ্রিত)।

"সকল মিথ্যাবাদী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়াড়ী, বিশ্বাসঘাতক, উৎকোচগ্রহণকারী, শঠ, অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী, জালিয়াত এবং উহাদের সঙ্গী, যাহারা নিজেদর ভ্রাতা এবং ভগ্নীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ লাগাইয়া থাকে এবং নিজেদের কুকর্ম হইতে তওবা করে না এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তাহারা আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশ্তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৯, ৪০)।

মিথ্যা

"যে ব্যক্তি মিথ্যা ও প্রতারণাকে পরিত্যাগ করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে"(কিশ্তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৮)।

"নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ মিথ্যার ন্যায় অভিশপ্ত কিছু নাই। সাধারণভাবে দুনিয়াদার ব্যক্তিরা বলে, সত্যবাদী ফাঁসিয়া যায়। কিন্তু আমি কীভাবে এই কথা মানিয়া

নিব ? আমার বিরুদ্ধে সাতটি মোকদ্দমা করা হইয়াছে এবং খোদাতাআলার ফযলে উহাদের কোন একটিতেও মিথ্যা বলার প্রয়োজন হয় নাই। কেহ কি বলিতে পারে, উহাদের একটিতেও খোদাতাআলা আমাকে পরাজিত করিয়াছেন ? আল্লাহ্‌তাআলা নিজেই সত্যবাদিতার সহায়ক ও সাহায্যকারী। ইহা কি হইতে পারে যে, তিনি সত্যবাদীগণকে শাস্তি দিবেন ? যদি এইরূপ হয় তবে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি সত্য বলার সাহস করিবে না এবং খোদাতাআলার উপর বিশ্বাস উঠিয়া যাইবে এবং সত্যবাদীতো জীবিতই মরিয়া যাইবে।

আসল কথা এই যে, সত্য বলার দরুন যে ব্যক্তি শাস্তি পায় উহা সত্যের কারণে হয় না। ঐ শাস্তি তাহার অন্য কোন গুপ্ত ও অধিকতর গুপ্ত মন্দ কর্মের জন্য হইয়া থাকে” (মলফুযাত, খন্ড ৮, পৃঃ ৩৫১ – ৩৫৩)।

“সত্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মিথ্যা পরিত্যাগ করে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্র হইতে পারে না। বেচারা দুনিয়াদার বলিতে পারে যে, মিথ্যা ছাড়া চলে না। ইহা একটি নিরর্থক কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা না যায় তবে মিথ্যা দ্বারা কখনো চলা যায় না। আফসোস, এই সকল হতভাগ্য লোক খোদাতাআলার কদর করে না। তাহারা জানে না যে, খোদাতাআলার ফযল ছাড়া চলা যায় না। তাহারা মুশ্‌কিল হইতে উদ্ধারকারী মিথ্যার মলকেই উপাস্য করে। ------- প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা অবলম্বনের দরুন মানুষের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং ভিতরে ভিতরেই তাহাকে উইপোকা আক্রমণ করিতে থাকে। অতঃপর একটি মিথ্যার জন্য তাহাকে অনেক মিথ্যা বানাইয়া লইতে হয়। কেননা, এই মিথ্যাকে সত্যের রং দিতে হয়। এইভাবে ভিতরে ভিতরেই তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর তাহার এতখানি হিম্মত ও দুঃসাহস বাড়িয়া যায় যে, সে খোদাতাআলার উপর মিথ্যারোপ করে এবং খোদাতাআলার নবী ও প্রত্যাদিষ্টগণকেও অস্বীকার করে” (মলফুযাত, খন্ড ১, পৃঃ ২৪৩-২৪৫)।

“ওয়াজতানিবুর রিজসা মিনাল আওসানি ওয়াজতানিবূ ক্বওলায্‌যূর”

(খোদা) প্রতিমা পূজাকে এই মিথ্যার সহিত একীভূত করিয়াছেন। নির্বোধ মানুষ যেভাবে আল্লাহ্‌তাআলাকে ছাড়িয়া পাথরের দিকে মাথা নোয়ায়, তদ্রূপেই সততা ও সত্যবাদিতাকে ছাড়িয়া নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যাকে প্রতিমা বানায়। এই কারণেই আল্লাহ্‌তাআলা ইহাকে প্রতিমাপূজার সহিত একীভূত করিয়াছেন এবং ইহার সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক প্রতিমা পূজারী যেভাবে প্রতিমার নিকট মুক্তি চায়, তদ্রূপে যে মিথ্যা বলে সে-ও তাহার পক্ষ হইতে প্রতিমা বানায় এবং মনে করে এই প্রতিমার মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া যাইবে। কীরূপ মন্দ জিনিস আসিয়া পড়িয়াছে ! যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কেন প্রতিমা পূজারী হও, এই পঙ্কিলতা ছাড়িয়া দাও, তবে বলা হয় কীভাবে ছাড়িয়া দিব ? ইহা ছাড়াতো চলিতে পারে না। ইহার চাইতে অধিক কি দুর্ভাগ্য হইবে যে, মিথ্যাকে নির্ভরশীল মনে করা হয়। কিন্তু আমি তোমাদিগকে নিশ্চিত বিশ্বাস দিতেছি যে, পরিণামে সত্যই কৃতকার্য হয়। ইহার মধ্যেই কল্যাণ ও বিজয় নিহিত আছে” (মলফুযাত, খন্ড ৮, পৃঃ ৩৪৯, ৩৫০)।

'রিয়া' (লোক দেখানো কাজ ও কথা)

"আত্মশ্লাঘা ও 'রিয়া' অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জিনিস। এইগুলি হইতে মানুষের বাঁচা উচিত। মানুষ একটি সৎকর্ম করিয়া লোকদের প্রশংসার আকাঙক্ষী হয়। বাহ্যতঃ ঐ সৎকর্ম ইবাদত, ইত্যাদির আকারে হইয়া থাকে যদ্বারা খোদাতাআলা রাজী হন। কিন্তু প্রবৃত্তির মধ্যে একটি আকাঙক্ষা গোপন থাকে যে, অমুক অমুক লোক আমাকে ভাল বলুক। ইহার নাম 'রিয়া" (মলফুযাত, খন্ড ৬, পৃঃ ৩৩৫)।

"মু'মিনের পরিপূর্ণতা ইহা যে, সে কখনো পসন্দ করে না তাহার সহিত খোদাতাআলার যে সম্পর্ক আছে অন্যেরা তাহা জানুক। বরং কোন কোন সুফী লিখিয়াছেন যে, যখন মু'মিন খোদাতাআলার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ভালবাসার দরুন গোপন নিভৃতে তাহার মুনাজাত করে ঐ সময় যদি কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে তবে ইহাতে সে খুব লজ্জিত হয়, যেভাবে কোন ব্যভিচারী ঠিক ব্যভিচারের সময় পাকড়াও হয়। অতএব 'রিয়া' হইতে বাঁচা উচিত এবং নিজের সকল কথা ও কাজকে ইহা হইতে সংরক্ষণ করা উচিত" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩৭০, নূতন এডিশন)।

কুধারণা

"কুধারণা এইরূপ একটি ব্যাধি এবং এইরূপ সাংঘাতিক বিপদ, যাহা মানুষকে অন্ধ করিয়া ধ্বংসের অন্ধ কুপে ফেলিয়া দেয়। কুধারণাই একজন মৃত ব্যক্তির পূজা করাইল। কুধারণাই লোকদিগকে খোদাতাআলার সৃজন, দয়া, রিযক দান, ইত্যাদি গুণাবলীকে রহিত করিয়া, নাউযুবিল্লাহ্, পরিত্যক্ত ব্যক্তি ও বস্তুর ন্যায় অর্থহীন করিয়া দেয়। মোট কথা, এই কুধারনার দরুন জাহান্নামের খুব বড় অংশ যদি বল পুরা অংশ ভরিয়া যাইবে, তবে অতিশয়োক্তি করা হইবে না। যে সকল লোক আল্লাহ্‌তাআলার প্রত্যাদিষ্টগণ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে তাহারা খোদাতাআলার পুরস্কারসমূহ ও তাঁহার 'ফযল' (আশীষ)-কে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে" (মলফুযাত, খন্ড ১, পৃঃ ৬২, নয়া এডিশন)।

"আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, কুধারণা খুবই সাংঘাতিক বিপদ, যাহা মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করিয়া দেয়, সততা ও সত্যবাদিতা হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়, এবং বন্ধুদিগকে দুশমন বানাইয়া দেয়। সত্যবাদীদের গুণাবলী অর্জন করার জন্য মানুষকে কুধারণা হইতে একান্তভাবে বাঁচিয়া থাকা জরুরী। যদি কাহারো সম্পর্কে কোন কুধারণা সৃষ্টি হয় তবে বেশী বেশী করিয়া 'ইস্তেগফার' কর এবং খোদাতাআলার নিকট দোয়া কর যেন এই বিপদ ও ইহার কুফল হইতে বাঁচিয়া যাও, যাহা এই কুধারণার পশ্চাতে আগমনকারী। ইহাকে কখনো সাধারণ ব্যাপার মনে করা উচিত নহে। ইহা খুবই বিপজ্জনক ব্যাধি, যদ্বারা মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হইয়া যায়। মোট কথা, কুধারণা মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়। এমনকি লেখা আছে যে, যখন দোযখী লোকদিগকে জাহান্নামে ফেলা হইবে তখন আল্লাহ্‌তাআলা তাহাদিগকে এই কথাই বলিবেন, তোমরা আল্লাহ্‌তাআলা সম্পর্কে কুধারণা করিয়াছ" (মলফুযাত, খন্ড ১, পৃঃ ২৪৬, ২৪৭)।

"কুধারণা হইতে অনিষ্ট সৃষ্টি হয়। কুরআন শরীফ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িলে ইহাই জানা যায় যে, আল্লাহ্‌তাআলা সম্পর্কে কুধারণা করিও না। আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গ ছাড়িও না। তাহার নিকট হইতেই সাহায্য চাও। আল্লাহ্‌তাআলা সকল ময়দানে

মু'মিনকে সাহায্য করেন। তিনি বলেন, আমি ময়দানে তোমার সঙ্গে আছি। তিনি তাহার জন্য একটি পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যে তাঁহার ওয়াদাসমূহের উপর ভরসা করে না, সে কুধারণা করে। যে ব্যক্তি খোদাতাআলার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করে, সে তাঁহার দিকে মনোনিবেশ করে এবং যে আল্লাহ্‌তাআলা সম্পর্কে কুধারণা করে সে অসহায় হইয়া পড়ে। সে তাহার জন্য অন্য উপাস্য বানায় এবং শিরকে জড়াইয়া পড়ে”(মলফুযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ৪৬)।

“অন্যের অভ্যন্তরে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। এইরূপ হস্তক্ষেপ করা পাপ। মানুষ এক ব্যক্তি সম্পর্কে কুধারণা করে। অতঃপর সে নিজেই তাহার চাইতে মন্দ হইয়া যায়। পুস্তকে আমি একটি কাহিনী পড়িয়াছি। এক বুযর্গ আল্লাহ্‌ওয়ালা ছিলেন। তিনি একবার প্রতিজ্ঞা করেন, আমি নিজেকে কাহারো চাইতে উত্তম মনে করিব না। একবার তিনি নদীর তীরে পৌঁছেন এবং দেখেন যে, এক ব্যক্তি এক যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত তীরে বসিয়া রুটি খাইতেছে এবং পাশে একটি বোতল আছে। ইহা হইতে সে গ্লাস ভরিয়া ভরিয়া পান করিতেছে। তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া তিনি কহিলেন, আমিতো প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি নিজেকে কাহারো চাইতে উত্তম মনে করিব না। কিন্তু ইহাদের দুইজনের চাইতে তো আমি উত্তম। ইতোমধ্যে জোরে বাতাস উঠিল এবং নদীতে তুফান আসিল। একটি নৌকা আসিতেছিল। উহা ডুবিয়া গেল। ঐ পুরুষটি, যে স্ত্রীলোকের সহিত রুটি খাইতেছিল, সে উঠিল এবং ডুব দিয়া ছয় ব্যক্তিকে বাহির করিয়া আনিল। তাহাদের জীবন বাঁচিয়া গেল। অতঃপর ঐ পুরুষ এই বুযর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তুমি নিজেকে আমার চাইতে উত্তম মনে কর। আমি তো ছয়জনের জীবন বাঁচাইয়াছি। এখন একজন বাকী আছে। তাহাকে তুমি বাহির কর। ইহা শুনিয়া তিনি খুব অবাক হইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার এই চিন্তা-ভাবনা কীভাবে বুঝিতে পারিলে ? এই ব্যাপারটি কী ? তখন এই যুবক বলিল, এই বোতলে এই নদীরই পানি আছে। ইহাতে মদ নাই এবং এই স্ত্রীলোক আমার মা। আমি তাহার একটিই সন্তান। তাহার শরীর খুব মজবুত। এই জন্য তাহাকে যুবতী মনে হয়। খোদা আমাকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, আমি যেন এইরূপ করি যাহাতে তুমি শিক্ষা গ্রহণ কর।

খিজিরের কাহিনীও এইরূপই মনে হয়। জলদী কুধারণা করা ঠিক নহে। বান্দাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ একটি নাজুক বিষয়। ইহা অনেক জাতিকেই ধ্বংস করিয়াছে। তাহারা নবীগণ (আঃ) ও তাঁহাদের আহ্‌লে বয়াত সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করিয়াছে” (মলফুযাত, খন্ড ৪, পৃঃ ২৬৫, ২৬৬)।

অহংকার

“আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, অহংকার হইতে বাঁচ। কেননা, অহংকার আমাদের মহা প্রতাপান্বিত খোদার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য। কিন্তু তোমরা সম্ভবতঃ বুঝিবে না যে, অহংকার কী জিনিস। অতএব আমার নিকট হইতে বুঝিয়া নাও। কেননা, আমি খোদা কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে বলিতেছি।

প্রত্যেক ব্যক্তি, যে নিজ ভাইকে এই জন্য হেয় জ্ঞান করে যে, সে তাহার চাইতে অধিক জ্ঞানী বা অধিক বুদ্ধিমান বা অধিক কৌশলী, সে অহংকারী। কেননা, সে

খোদাকে বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস মনে করে না এবং নিজেকে কিছু একটা সাব্যস্ত করে। খোদা তাহাকে পাগল করিয়া দিতে এবং তাহার ঐ ভাইকে, যাহাকে সে হেয় মনে করে, তাহার তুলনায় তাহাকে উত্তম জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশল দান করিতে কি শক্তিমান নহেন ? তদ্রূপেই ঐ ব্যক্তি, যে নিজের কোন ধন-ঐশ্বর্য-এর কথা মনে করিয়া তাহার ভাইকে হেয় জ্ঞান করে, সে-ও অহংকারী। কেননা, সে এই কথা ভুলিয়া গিয়াছে যে, এই ধন-ঐশ্বর্য খোদাই তাহাকে দিয়াছিলেন। সে অন্ধ এবং সে জানে না যে, ঐ খোদা সর্বশক্তিমান। তিনি তাহার উপর এইরূপ একটি বিপদ অবতীর্ণ করিতে পারেন যাহা এক মুহূর্তে তাহাকে **আসফালা সাফেলীন** (অর্থঃ হেয় হইতে হেয়তর স্তরে) পর্যায় লইয়া যাইতে পারে এবং তাহার ঐ ভাইকে, যাহাকে সে হেয় জ্ঞান করে, তাহার চাইতে অধিক উত্তম ধন-সম্পদ দান করিতে পারেন। তদ্রূপেই ঐ ব্যক্তি, যে নিজের দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে গর্ব করে, বা নিজের সৌন্দর্য ও রূপ এবং শক্তি ও সামর্থ্যের ব্যাপারে দাম্ভিক হয় এবং নিজের ভাইকে হাসি-বিদ্রূপের সহিত ছোট করে এবং তাহার দৈহিক ত্রুটির কথা লোকদেরকে শুনায়, সে-ও অহংকারী। সে এই খোদা সম্পর্কে অনবহিত যে, তিনি এক মুহূর্তে তাহার উপর এইরূপ দৈহিক ত্রুটি আনিতে পারেন যদ্দরুন সে ঐ ভাই-এর চাইতেও কুৎসিৎ হইতে পারে। দীর্ঘকাল যাবৎ যাহাকে হেয় জ্ঞান করা হইয়াছে খোদা তাহার শক্তিতে এইরূপ বরকত দিতে পারেন যে, সে না ছোট থাকিবে এবং না পরিত্যক্ত হইবে। কেননা, তিনি যাহা চান তাহা করেন। এইরূপেই ঐ ব্যক্তি, যে তাহার শক্তির উপর ভরসা করিয়া দোয়ায় অলস হয়, সে-ও অহংকারী। কেননা, সে শক্তি ও কুদরতের উৎসকে সনাক্ত করে নাই এবং নিজেকে কিছু একটা মনে করিয়াছে। অতএব তোমরা হে আমরা বন্ধুরা ! এই সকল কথা স্মরণ রাখ। এমন যেন না হয় যে, তোমরা কোন দিক হইতে খোদাতাআলার দৃষ্টিতে অহংকারী সাব্যস্ত হইয়া যাও এবং তোমরা তাহা সম্পর্কে অনবহিত থাক। এক ব্যক্তি, যে তাহার এক ভাইকে ভুল কথা দ্বারা অহংকারের সহিত সংশোধন করে, সে-ও অহংকারে অংশ নিয়াছে। এক ব্যক্তি, যে তাহার ভাই-এর কথা বিনয়ের সহিত শুনিতে চায় না এবং মুখ ফিরাইয়া নেয়, সে-ও অহংকারে অংশ নিয়াছে। এক গরীব ভাই, যে তাহার পাশে বসিয়াছে এবং সে তাহাকে ঘৃণা করে, সে-ও অহংকারে অংশ নিয়াছে। এক ব্যক্তি, যে দোয়াকারীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সহিত দেখে, সে-ও অহংকারে একটি অংশ নিয়াছে। ঐ ব্যক্তি, যে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত পুরুষের পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য করিতে চায় না, সে-ও অহংকারে একটি অংশ নিয়াছে। ঐ ব্যক্তি, যে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত পুরুষের কথা মনোনিবেশের সহিত শুনে না এবং তাঁহার লেখা মনোযোগের সহিত পড়ে না, সে-ও অহংকারে একটি অংশ নিয়াছে। অতএব চেষ্টা কর যেন অহংকারের কোন অংশ তোমাদের মধ্যে না থাকে যাহাতে তোমরা ধ্বংস না হও এবং পরিবার-পরিজনসহ মুক্তি পাও। খোদার প্রতি ঝোঁক। পৃথিবীতে যতখানি কাহাকেও ভালবাসা সম্ভব তাহাকে ততখানি ভালবাস। পৃথিবীতে যতখানি মানুষ কাহাকেও ভয় পাইতে পারে তোমরা ততখানি ভয় তোমাদের খোদাকে কর। পবিত্র হৃদয়ের মানুষ হইয়া যাও। পবিত্র ইচ্ছার মানুষ হইয়া যাও। গরীব

মিসকীন ও অনিষ্টকারিতাহীন হইয়া যাও যাহাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়”(নযূলুল মসীহ্, পৃঃ ২৬, ২৭)।

“অতএব তোমরা সোজা-সরল হইয়া যাও; পরিচ্ছন্ন হইয়া যাও; পবিত্র হইয়া যাও; এবং খাঁটি হইয়া যাও। যদি এক বিন্দু অন্ধকার তোমাদের মধ্যে বাকী থাকে তবে উহা তোমাদের সকল জ্যোতিঃ বিনষ্ট করিয়া দিবে। যদি কোন দিক হইতে তোমাদের মধ্যে অহংকার বা ‘রিয়া’ বা আত্মশ্লাঘা বা আলস্য থাকে তবে তোমরা গ্রহণযোগ্য হইবে না। এমন যেন না হয় যে, তোমরা কয়েকটি কথা লইয়া নিজদিগকে ধোঁকা দাও যে, আমাদের যাহা কিছু করার ছিল করিয়া ফেলিয়াছি। কেননা, খোদা চাহেন যে, তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ পরিবর্তন আসুক। খোদা তোমাদের নিকট হইতে এক মৃত্যু চাহেন। ইহার পর তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন” (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ২৫)।

“হে মাটির কীট! অহংকার ও দম্ভ বিসর্জ্জন দাও। অহংকার শোভা পায় আত্মাভিমানী সম্মানিত খোদার। নিজের ধারণায় সকলের নিকট নিকৃষ্ট হইয়া যাও। সম্ভবতঃ ইহাতেই মিলনস্থলের প্রবেশ পত্র পাইবে। দম্ভ ও অহংকার বিসর্জন দাও। ইহার মধ্যেই নিহিত আছে তাকওয়া। মাটি হইয়া যাও। ইহার মধ্যেই নিহিত আছে প্রভুর সন্তুষ্টি। খোদার জন্য বিনয় অবলম্বন করার মধ্যে রহিয়াছে তাকওয়ার শিকড়। অশ্লীলতা হইতে বাঁচিয়া থাক, যাহা ধর্মের শর্ত, ইহার সবটাই নিহিত আছে তাকওয়ার মধ্যে” (বারাহীনে আহমদীয়া, পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ৯০৮)।

“অহংকার কয়েক প্রকারের হইয়া থাকে। কখনো ইহা চক্ষু হইতে বাহির হয় যখন অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়। ইহার এই অর্থই হয় যে, অন্যকে হেয় ও নিজেকে বড় জ্ঞান করা হয়। কখনো ইহা মুখ হইতে বাহির হয়। কখনো ইহার প্রকাশ মাথা দ্বারা করা হয়। কখনো হাত ও পা দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। মোট কথা, অহংকারের কয়েকটি উৎস আছে। এই সকল উৎস হইতে বাঁচিয়া থাকা মু’মিনের উচিত। ইহার কোন অংশ এমন যেন না হয়, যাহা হইতে অহংকারের গন্ধ আসে এবং উহা অহংকার প্রকাশকারী।

সুফীগণ বলেন, মানুষের মধ্যে মন্দ চরিত্রের অনেক জিন্ন আছে। যখন এইগুলি বাহির হইতে থাকে তখন বাহির হইতেই থাকে। কিন্তু সবগুলির চাইতে শেষের জিন্ন হইয়া থাকে অহংকার, যাহা তাহার মধ্যে থাকে। উহা খোদাতাআলা ফযল ও মানুষের খাঁটি প্রচেষ্টা ও দোয়া দ্বারা দূর হয়।

অনেক লোক নিজেদেরকে বিনয়ী মনে করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও কোন না কোন প্রকারের অহংকার থাকে। এই জন্য অহংকারের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর প্রকারসমূহ হইতে বাঁচা উচিত। কোন কোন সময়ে এই অহংকার ধন-সম্পদ হইতে সৃষ্টি হয়। ধনী অহংকারী অন্যদেরকে কাঙাল মনে করে এবং বলে, এই ব্যক্তি কে, যে আমার মোকাবেলা করে ? কোন কোন সময় বংশের ও জাতের অহংকার হইয়া থাকে। সে মনে করে আমার জাত বড় এবং এই ব্যক্তি ছোট জাতের। .... কোন কোন সময় অহংকার জ্ঞানের দরুনও সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি ভুল বলিলে সে তাড়াতাড়ি তাহার দোষ ধরে এবং হৈ চৈ করে যে, এ তো একটি শব্দও সঠিক বলিতে পারে না। মোট কথা, অহংকার বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে এবং ইহাদের সব কয়টি মানুষকে

নেকী হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয় এবং মানুষের উপকার করা হইতে বাধা দিতে থাকে। এই সব হইতে বাঁচা উচিত। কিন্তু এই সব হইতে বাঁচার জন্য এক মৃত্যুর প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই মৃত্যুকে গ্রহণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার উপর খোদাতাআলার বরকত অবতীর্ণ হইতে পারে না এবং খোদাতাআলা তাহার অভিভাবক হইতে পারেন না" (মলফুযাত, ষষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৪০১,-৪০৩)।

"অহংকার ও দুষ্টামী খারাপ জিনিষ। একটি সামান্য কথা দ্বারা সত্তর বৎসরের আমল (পুণ্যকর্ম) বিনষ্ট হইয়া যায়। লেখা আছে যে, এক ব্যক্তি 'আবেদ' (খোদার উপাসনাকারী) ছিল। সে পাহাড়ের উপর থাকিত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে বৃষ্টি হয় নাই। এক দিন বৃষ্টি হইল। ঐ বৃষ্টি পাথর ও কাঁকরের উপরও হইল। তখন তাহার হৃদয়ে এই আপত্তির উদ্ভব হইল যে, বৃষ্টির প্রয়োজন তো ছিল ক্ষেত ও বাগানের জন্য। ইহা কেমন ব্যাপার যে, পাথরের উপর বৃষ্টি হইল ? এই বৃষ্টিই যদি ক্ষেতে-খামারে হইত তবে কতই না উত্তম হইত ! ইহাতে খোদাতাআলা তাহার সমস্ত বেলায়েত ছিনাইয়া নিলেন। অবশেষে সে খুবই ব্যথাতুর হইল। ...... এখন দেখ, মানুষ কত আপত্তি উত্থাপন করে। যদি একটু বেশী বৃষ্টি হয় তখন বলে, আমাদেরকে ডুবাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যদি বৃষ্টিপাতে কিছুটা বিরতি হয় তখন বলে, এখন আমাদিগকে মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল আপত্তি কতইনা মন্দ ! দেখ, তাকওয়া কত কম হইয়া গিয়াছে। যদি দুই এক আনা রাস্তায় পাওয়া যায় তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া নেয় এবং এ সম্পর্কে কাহাকেও বলে না। অথচ ব্যাপারটি সকলকে শুনাইয়া দেওয়া ও যাহার ছিল তাহাকে দিয়া দেওয়াই ছিল তাকওয়ার কাজ। এরপরও বলে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টি কীভাবে হইবে ? আল্লাহ্‌তাআলা অনেক পাপ ক্ষমাই করিয়া দেন। যদি বেশী বৃষ্টি হয় তবে দোহাই দেওয়া হয়। যদি রোদ বেশী হয় তখনও দোহাই দেওয়া হয়। এই সকল অবস্থায় মানুষ তাকওয়াশূন্য হইয়া পড়ে। অতএব ধৈর্য ধারণ করা উচিত। যদি ধৈর্য ধারণ না করা হয় তবে কাফের হইয়া রুটি খাওয়া তো হারাম। মানুষের উচিত কখনো খোদাতাআলার উপর আপত্তি উত্থাপন না করা" (মলফুযাত, খন্ড ৬, পৃঃ ৫৭, ৮ নভেম্বর, মদ্রণ, ১৯২৩ইং)।

কুৎসা

"কুরআন করীমের শিক্ষা কখনো ইহা নহে যে, দোষ দেখিয়া উহা ছড়াও এবং অন্যদের বলিয়া বেড়াও ; বরং বলা হইয়াছে যে, 'তাওয়াসাও বিস্‌সবরি তাওয়াসাও বিল মারহামাহ্' সে ধৈর্য ও দয়ার সহিত উপদেশ দেয়। দয়া ইহাই যে, অন্যের দোষ দেখিলে তাহাকে উপদেশ দিতে হইবে এবং তাহার জন্য দোয়াও করিতে হইবে। দোয়াতে বড়ই প্রভাব আছে। ঐ ব্যক্তি খুবই আফসোসের যোগ্য, যে একজনের দোষতো শতবার বর্ণনা করে, কিন্তু দোয়া করে না একবারও। কাহারো দোষ ঐ সময় বর্ণনা করা উচিত যখন উহার পূর্বে তাহার জন্য কমপক্ষে চল্লিশ দিন কাঁদিয়া দোয়া করা হইয়া থাকে" (মলফুযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ৭৯)।

"এক সুফীর দুইজন শীষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন মদ পান করিল এবং বেহুশ হইয়া নর্দমায় পড়িল। অন্যজন সুফীর নিকট অভিযোগ করিল। তিনি বলিলেন, তুমি বড় বেয়াদব যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছ এবং গিয়া তাহাকে উঠাইয়া

আন নাই। সে তখনই গেল এবং তাহাকে উঠাইয়া নিয়া চলিল। লোকেরা বলাবলি করিতেছিল যে, একজনতো মদ পান করিয়াছে। দ্বিতীয়জন কম পান করিয়াছে। তাই তাহাকে উঠাইয়া নিয়া যাইতেছে। সুফীর বলার উদ্দেশ্য ইহা ছিল যে, কেন তুমি তোমার ভাই এর কুৎসা করিলে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে কুৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, কুৎসা হইল কাহারো সত্য কথা তাহার অনুপস্থিতিতে এইভাবে বর্ণনা করা যে, যদি সে উপস্থিত থাকিত তাহার খারাপ লাগিত। তাহার সম্পর্কে যে দোষের কথা বলিতেছ যদি তাহা তাহার মধ্যে না থাকে তবে ইহার নাম অপবাদ। খোদাতাআলা বলেন, "এবং একে অপরের পিছনে গীবত (কুৎসা) করিয়া বেড়াইও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাইতে চাইবে ? (সূরা আল্ হুজুরাত - আয়াত ১৩) । ইহাতে কুৎসা করাকে এক ভাই এর মাংস খাওয়ারূপে অভিহিত করা হইয়াছে। এই আয়াত হইতে এই কথাও প্রমাণিত হয় যে, যাহারা ঐশী সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত তাহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কুৎসাকারীও হইয়া থাকে। যদি এইরূপ না হইত তবে এই আয়াত অর্থহীন হইয়া পড়িত। যদি মু'মিনরা এইরূপই পবিত্র হইত এবং তাহাদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত না হইত তবে এই আয়াতের কী প্রয়োজন ছিল (মলফুযাত, খন্ড ৭, পৃঃ ৭৮) ?

কু–সংসর্গ

"যে ব্যক্তি মন্দ বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করে না, যাহারা তাহার উপর কুপ্রভাব বিস্তার করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশ্তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৮)।

"যে ব্যক্তি বিরুদ্ধবাদীদের দলে বসে এবং তাহাদের কথায় সায় দেয়, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশ্তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৯)।

হিংসা

"যতক্ষণ পর্যন্ত বক্ষঃ পরিষ্কার না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া কবুল হয় না। যদি কোন জাগতিক ব্যাপারে এক ব্যক্তির জন্যও তোমার বক্ষেঃ হিংসা থাকে তবে তোমার দোয়া কবুল হইতে পারে না। এই কথাটি উত্তমরূপে স্মরণ রাখা উচিত। জাগতিক বিষয়ের দরুন কখনো কাহারো প্রতি হিংসা পোষণ করা উচিত নহে। দুনিয়া ও ইহার উপকরণাদির কি মূল্য আছে যে, ইহার জন্য তুমি কাহারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করিবে " (মলফুযাত, খন্ড ৯, পৃঃ ২১৭, ২১৮) ?

কে আমার অন্তর্ভুক্ত ?

"কে আমার অন্তর্ভুক্ত ? সে-ই, যে পাপ পরিত্যাগ করে এবং পুণ্য অবলম্বন করে, যে বক্রতা পরিহার করে এবং ন্যায়-নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যে শয়তানের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় এবং খোদাতাআলার এক অনুগত বান্দায় পরিণত হয়। যাহারা এইরূপ

করে তাহারা আমার মধ্যে আছে এবং আমি তাহাদের মধ্যে আছি। কিন্তু এইরূপ করিতে কেবল সে-ই সমর্থ হয় যাহাকে খোদাতাআলা নফ্‌স পবিত্রকারীর ছায়ায় নিয়া আসেন। তখন তিনি তাহার নফ্‌সের দোযখে নিজের পা রাখিয়া দেন। তখন সে এইরূপ ঠান্ডা হইয়া যায় যেন তাহার মধ্যে কখনো আগুন ছিল না। তখন সে উন্নতির পর উন্নতি করে। এমনকি খোদার আত্মা তাহার মধ্যে অবস্থান করে এবং একটি বিশেষ জ্যোর্তিবিকাশের সহিত 'রব্বুল আলামীন' (নিখিল বিশ্বের প্রভু) তাহার হৃদয়ে অবস্থান করেন। তখন তাহার পুরাতন মনুষ্যত্ব জ্বলিয়া যায় এবং তাহাকে একটি নূতন ও পবিত্র মনুষ্যত্ব দান করা হয়। খোদাতাআলাও এক নূতন খোদা হইয়া তাহার সহিত এক নূতন ও বিশেষ রঙে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সে এই পৃথিবীতেই বেহেশ্‌তী জীবনের সকল পবিত্র উপকরণ পাইয়া যায়" (ফতেহ্ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন জিলদ ৩, পৃঃ ৩৪, ৩৫)।

"আমিতো অনেক দোয়া করিতেছি যে, আমার সম্প্রদায়ভুক্ত সকলে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হউক যাহারা খোদাতাআলাকে ভয় করে, নামাযে কায়েম থাকে, রাত্রিতে উঠিয়া মাটিতে সেজদাবনত হয় এবং ক্রন্দন করে, খোদার ফরযসমূহকে বিনষ্ট করে না, এবং কৃপণ ও কঞ্জুস, গাফেল ও দুনিয়ার কীট নহে। আমি আশা করি আমার এই দোয়া খোদাতাআলা কবুল করিবেন এবং আমাকে দেখাইবেন যে, আমি আমার পশ্চাতে এইরূপ লোকদিগকেই রাখিয়া যাইতেছি। কিন্তু ঐ সকল লোক, যাহাদের চক্ষু ব্যভিচার করে এবং যাহাদের হৃদয় পায়খানা হইতেও নিকৃষ্ট এবং যাহারা কখনো মৃত্যুর কথা স্মরণ করে না, আমি ও আমার খোদা তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট। আমি খুবই সন্তুষ্ট হইব যদি এইরূপ ব্যক্তিরা এই সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নেয়" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাঈন, ও রূহানী খাযায়েন, জিলদ-২০, পৃঃ ৭৭ মুদ্রণ ১৯৬৭)।

"দোয়া করিতেছি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মধ্যে জীবনের নিঃশ্বাস থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত করিতে থাকিব। দোয়া ইহাই যে, খোদাতাআলা আমার এই সম্প্রদায়ভুক্তদের হৃদয়কে পবিত্র করুন, তাহার রহমতের হাত লম্বা করিয়া তাহাদের হৃদয় তাঁহার দিকে ফিরাইয়া দিন এবং সকল দুষ্টামী ও বিদ্বেষ তাহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া দিন এবং পরস্পরের মধ্যে খাঁটি ভালবাসা সৃষ্টি করুন। আমি বিশ্বাস করি যে, এই দোয়া কোন সময় কবুল হইবে এবং খোদা আমার দোয়াসমূহকে বিনষ্ট করিবেন না। হ্যাঁ, আমি এই দোয়াও করিতেছি যে, যদি আমার জামাতের কোন ব্যক্তি খোদাতাআলার জ্ঞানে ও ইচ্ছায় চির অভিশাপগ্রস্থ হয় যাহার জন্য ইহা নির্ধারিতই নহে যে, সে খাঁটি পবিত্র ও খোদা-ভীতি অর্জন করিবে, হে সর্বশক্তিমান খোদা, তাহাকে আমার তরফ হইতেও ফিরাইয়া দাও যেভাবে সে তোমার তরফ হইতে ফিরিয়া গিয়াছে এবং তাহার জায়গায় অন্য কাহাকেও নিয়া আস যাহার হৃদয় কোমল এবং যাহার প্রাণে তোমার অন্বেষার স্পৃহা আছে" (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, জিলদ-৬, পৃঃ ৩৯৮)।

----- o -----

Bengali Translation of the book
Hazrat Bani Silsila Ahmadiyya Ki Nazar Mey Ek Asli Ahmadi
(Perfect Ahmadi in the sight of the Founder of Ahmadiyya Sect)

Translated by
Nazir Ahmad Bhuiyan

Published by
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road Dhaka-1211, Bangladesh

inted at Intercon Associates